জ্ঞানাঞ্জলি।

রিপণকলেজের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক
শ্রীঅতুলচন্দ্র সেন এম্ এ, বি এল,
প্রণীত।

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী
১নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

Printed by T. C. Dass,
AT THE CHERRY PRESS LTD,
251 Bowbazar Street, Calcutta.
&
Published by the Author
168, Bowbazar Street, CALCUTTA.

ভূমিকা।

উচ্চ ইংরাজী স্কুলের সপ্তম ও অষ্টম (প্রাচীন তৃতীয় ও চতুর্থ) শ্রেণীর জন্য "জ্ঞানাঞ্জলি" রচিত হইল। ইহা আজকালকার ধরণের সংগ্রহ পুস্তক নহে। একটিমাত্র প্রবন্ধ ব্যতীত আর সমস্তই গ্রন্থকারের নিজের লেখা, সুতরাং গ্রন্থের সর্ব্বপ্রকার ত্রুটীর জন্য গ্রন্থকারই সম্পূর্ণরূপে দায়ী।

গ্রন্থের ভাষা ও বিষয় সম্বন্ধে অধিক কিছু বলিবার নাই। ছাত্রগণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা উদ্রিক্ত করিবার উদ্দেশ্যে কয়েকটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইল। গ্রন্থখানি যাহাতে অল্পবয়স্ক ছাত্রগণের চিত্তাকর্ষক হয় তজ্জন্য যত্ন ও চেষ্টার ত্রুটী হয় নাই। এক্ষণে শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষগণের উৎসাহ এবং সহানুভূতি পাইলেই শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

কলিকাতা
১৯১৬

গ্রন্থকার।

সূচী-পত্র।

জ্ঞানাঞ্জলি।

ইতর-প্রাণীর প্রতি ব্যবহার।

মানুষ সাধারণতঃ ইতরপ্রাণীগুলিকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকে, কারণ মানুষের যেরূপ বুদ্ধি এবং বিচারশক্তি আছে উহাদের তদ্রূপ নাই। পশুপক্ষী প্রভৃতির বিচারশক্তি না থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের অনুভব শক্তি নিশ্চয়ই আছে। আমাদের শরীরে আঘাত লাগিলে আমরা যেরূপ বেদনা অনুভব করি পশুপক্ষীরাও তদ্রূপ করিয়া থাকে, ক্ষুৎপিপাসায় আমরা যেরূপ আকুল হই ইতরপ্রাণীরাও তদ্রূপ হইয়া থাকে। ঝড়, বৃষ্টি, রৌদ্র,ও শীতে তাহারাও ক্লেশ অনুভব করে, অতিশ্রমে তাহারাও ক্লান্ত হয়। বাস্তবিক শারীরিক ক্লেশ এবং যন্ত্রণা মানুষ অপেক্ষা পশুপক্ষীরা কম অনুভব করিয়া থাকে এরূপ মনে করিবার কোনও সঙ্গত হেতু নাই। পশু-পক্ষীকে আঘাত করিলে উহারা যেরূপ কাতরস্বরে চীৎকার করিতে থাকে তাহাতেই উহাদের শারীরিক যন্ত্রণা অনুমিত হইতে পারে।

পশুপক্ষীদের যদি শারীরিক যন্ত্রণা অনুভব করিবার শক্তি থাকে তবে তাহাদিগকে অনর্থক যন্ত্রণা দেওয়া কি মানুষের কাজ? অপরের কষ্ট বা যন্ত্রণা দেখিলে নিজ হৃদয়ে দুঃখ বা কষ্ট বোধ করা মানুষের স্বাভাবিক বৃত্তি। এই সমবেদনা না থাকিলে মানুষের পক্ষে সমাজবন্ধন করিয়া বাস করা অসম্ভব হইত। যাহার হৃদয় অপরের কষ্টে ব্যথিত হয় না সে মনুষ্যনামের অযোগ্য। কিন্তু আমাদের

এই সহানুভূতি ব্যক্তিবিশেষ কি জাতিবিশেষে আবদ্ধ হওয়া উচিত নহে। যে কেবল নিজ আত্মীয়স্বজনের ব্যথাই বোঝে, অপরের কষ্ট বোঝে না তাহার হৃদয় অতি সঙ্কীর্ণ। যাহাদের হৃদয় উন্নত, সমগ্র মানবজাতির কেন সমস্ত প্রাণিজগতের দুঃখে তাহাদের হৃদয় ব্যথিত হয়। বিশেষতঃ এই প্রাণিসমূহের কষ্ট নিজের চক্ষে দেখিয়া দুঃখিত না হওয়া নিতান্তই অস্বাভাবিক। দূরহইতে পরের কষ্ট শুনিয়া আমাদের হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক না হইতেও পারে। কিন্তু অনেকস্থলে ইতরপ্রাণীদিগকে আমরা নিজেই যন্ত্রণা দিয়া থাকি, অথবা যন্ত্রণার কার্য্য আমাদের সমক্ষেই অনুষ্ঠিত হয়। এরূপ স্থলে উহাদের প্রতি সহানুভূতির অভাব নিশ্চয়ই কঠিন হৃদয়ের পরিচায়ক।

ইতরপ্রাণীদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করিবার অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথমতঃ উহারা শক্তিহীন এবং প্রতিকারে অসমর্থ। কোন কোন ইতরপ্রাণীর যথেষ্ট শারীরিক বল থাকিলেও বুদ্ধিবলে সমস্ত পশুজাতি আমাদের পদানত। আমরা যদি উহাদিগকে যন্ত্রণা দেই তবু উহাদের কোনরূপ প্রতিকারের সামর্থ্য নাই। যন্ত্রণায় চীৎকার করা এবং ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক বেদনা সহ্য করা ব্যতীত উহাদের অন্য উপায় নাই। এমন কি মনের কষ্ট অন্যের নিকটে মুখ ফুটিয়া প্রকাশও করিতে পারে না। এহেন শক্তিহীন এবং প্রতিকারে অসমর্থ প্রাণীদিগকে অযথা যন্ত্রণা দেওয়া কতদূর নৃশংসতার কার্য্য তাহা সহজেই অনুমেয়।

অধিকাংশ ইতরপ্রাণী যে কেবল শক্তিহীন তাহা নহে, উহারা একবারে নিরাশ্রয়। শক্তিহীন লোকেরা উৎপীড়নের ভয়ে পলাইয়া

অন্যত্র আশ্রয় লাভ করিতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ পশুপক্ষীর পক্ষে তাহাও অসম্ভব। পলায়ন করিয়া যাইবে কোথায়? যতই নির্দ্দয়ভাবে ব্যবহৃত হউক তাহাদিগকে পুনরায় অত্যাচারীরই শরণাপন্ন হইতে হইবে।

গো-মহিষাদি গৃহপালিত পশুগুলি মনুষ্যের আশ্রয়েই বাস করে এবং বহুদিনের একত্র সহবাসে তাহাদের প্রতি কতকটা স্নেহ-মমতা হওয়াই স্বাভাবিক। আমরা অনেক স্থলে দেখিতে পাই যে বাড়ীর ছেলেপিলেরা গৃহপালিত পশুপক্ষীর প্রতি অতি সস্নেহ ব্যবহার করিয়া থাকে। ঐ পশুপক্ষীগুলিও সেই স্নেহের প্রতিদান করে এবং যথাসাধ্য প্রভুর আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়া থাকে। উহারা অতীব নিরীহ। কখন কাহারও অনিষ্ট সাধন করে না। এরূপ স্থলে আশ্রিতের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার নিতান্তই ঘৃণার্হ।

এই শ্রেণীর পশুপক্ষীগুলি যে কেবল আমাদের আশ্রয়ে বাস করে তাহা নহে, উহারা আমাদের অনেক উপকার সাধন করিয়া থাকে। গো, মহিষ, অশ্ব প্রভৃতি জন্তুগুলি যে আমাদের কত উপকারী তাহা বর্ণনাতীত। গাভী না থাকিলে দুগ্ধের অভাবে আমাদের বাঁচিয়া থাকা কঠিন হইত, বলদ ও মহিষ না থাকিলে কৃষিকার্য্য সহজ হইত না, অশ্ব না থাকিলে দূরস্থানে যাতায়াত অসুবিধাজনক হইত। মোটকথা, উহারা আমাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের অত্যাবশ্যকীয় উপকরণ। উহাদের সাহায্য না পাইলে এ সংসারে আমাদের জীবনধারণই এক প্রকার অসম্ভব। এহেন উপকারী জন্তুদিগকে অনর্থক যন্ত্রণা দেওয়া কি কৃতঘ্নের কাজ নয়?

কিন্তু এতবড় কৃতঘ্নতাও আমাদের সহিয়া গিয়াছে। গৃহপালিত পশুপক্ষীকে যে আমরা সময় সময় একটু যত্ন করি সে কেবল স্বার্থের অনুরোধে। গরুকে আহার দিতে হয় নচেৎ গরুতে দুধ দেয় না, ঘোড়াকে একটু যত্ন করিতে হয় নচেৎ উহার মূল্য কমিয়া যায় এবং যখনই আমাদের এই স্বার্থটুকু নষ্ট হয় তখন আর আমরা জন্তুগুলির প্রতি ফিরিয়াও তাকাই না। গরু অথবা ঘোড়া বৃদ্ধ বা কার্য্যাক্ষম হইলে উহাদের প্রতি যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করা হয় তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। অতিবৃদ্ধ বা রুগ্ন গরু মহিষগুলিকে নির্ম্মমপ্রাণে কসাইয়ের নিকট বিক্রয় করার দৃষ্টান্ত, বিরল নহে।

এইপ্রকার নিষ্ঠুরতা আমাদের মধ্যে সংক্রামক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। একের দৃষ্টান্ত অপরে অনুকরণ করে। এসম্বন্ধে সকলেরই প্রায় একরূপ ধারণা, কাযেই এরূপ ব্যবহারে কেহই লজ্জা বা ঘৃণা বোধ করে না। নিতান্ত নিষ্ঠুরভাবে যাহারা পশু হত্যা করে তাহাদিগকেও কেহ কিছু বলে না। এই যে রাজপথে প্রকাশ্য দিবালোকে শত শত গাড়োয়ান অসহায় গরু এবং ঘোড়াগুলির প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিতেছে কে তাহার প্রতিবাদ করে? এ নিষ্ঠুরতা নিবারণের জন্য রাজার কোনও আইন নাই, সমাজের শাসন নাই, জনসাধারণের কোন চেষ্টা নাই। কাজেই দেশের মধ্যে পশুজাতির প্রতি অমানুষিক অত্যাচার এবং নিষ্ঠুরতা অবাধে চলিয়া আসিতেছে।

আমাদের নিকট হইতে আমাদের সন্তানসন্ততিগণও এই নিষ্ঠুরতা শিক্ষা করিতেছে। আমরা এ বিষয়ে বালকবালিকাদিগকে

শাসন করি না, অথবা উহাদিগকে কোন উপদেশ দিই না। কাযেই উহাদের মধ্যে এমন নিষ্ঠুরপ্রকৃতি বালক দেখা যায় যাহারা পশুপক্ষীর প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিয়া অত্যন্ত আমোদ অনুভব করে। পাখীর ডানা ছিড়িয়া দেওয়া, কুকুর বিড়াল প্রভৃতিকে অনর্থক প্রহার করা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গগুলিকে নৃশংস ভাবে হত্যা করা উহাদের নিত্য কার্য্য। সৎশিক্ষা এবং উচ্চ দৃষ্টান্তের অভাবে এই সব নিষ্ঠুরতা অনেকের প্রকৃতিতে বদ্ধমূল হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

কিন্তু এপ্রকার নিষ্ঠুরতা উপেক্ষার বিষয় হওয়া উচিত নহে। ক্রমাগত নির্দ্দয় ব্যবহারে আত্মার অবনতি হয়। অপরের দুঃখে সমবেদনা অনুভব করা মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। যে কোন প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহারে এই স্বাভাবিক ধর্ম্ম নষ্ট হইয়া যায়। ইতরপ্রাণীর কষ্ট দেখিতে দেখিতে আত্মার এরূপ একটা জড়তা জন্মে যে উত্তরকালে মানুষের কষ্টেও দুঃখ অনুভব করিবার শক্তি কমিয়া যায়। অবশ্য সাংসারিক হিসাবে ইহাতে কোনও ক্ষতি না হইতে পারে, কিন্তু কেবল সাংসারিক লাভ ক্ষতি গণনা করাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য নহে। যে কার্য্যে আত্মার অবনতি হয়, হৃদয় কঠিন হইয়া যায়, তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে ইতরপ্রাণীর প্রতি সদয় ব্যবহারের বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। ঋষিদিগের তপোবনে পশুপক্ষিগণ নিঃশঙ্কচিত্তে বিচরণ করিত। কেহ তাহাদের হিংসা করিতে পারিত না। এমন কি হিংস্র প্রাণিসমূহ মহর্ষিগণের তপঃপ্রভাবে

আপনাদের হিংস্র স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া মেষশাবকের ন্যায় নিরীহ হইয়া যাইত। আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষগণ গোজাতিকে ভ্রাতৃতুল্য বলিয়া মনে করিতেন। সর্ব্বত্রই নিরীহ ইতরপ্রাণীর প্রতি শ্রদ্ধার ভাব দৃষ্টিগোচর হইত।

কিন্তু মধ্যযুগে যাগযজ্ঞের অতিশয় প্রচলন হওয়াতে জীব-হিংসার প্রবৃত্তিও অত্যন্ত বাড়িয়া গিয়াছিল। অশ্বমেধাদি যজ্ঞে এবং নানাবিধ দেবদেবীর পূজাতে পশুবলির প্রথা এই সময়েই বিশেষ ভাবে প্রচলিত হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বপর্য্যন্ত এই পশুবধপ্রথা অব্যাহতগতিতে চলিয়াছিল। মহাত্মা বুদ্ধদেব এই অকারণ জীবহিংসায় ব্যথিত হইয়া "অহিংসা পরম ধর্ম্ম" এই মহাবাণীর প্রচার করেন। বুদ্ধদেবপ্রচারিত ধর্ম্ম একসময়ে ভারতবর্ষে সাতিশয় প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অবনতির সঙ্গে জীবহিংসার ভাবও ভারতবর্ষ হইতে কতক পরিমাণে তিরোহিত হইয়াছিল। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষে বহুদিন স্থায়ী হইতে পারিল না, এবং ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে জীবহিংসাও পুনরায় কতক পরিমাণে প্রসার লাভ করিয়াছে।

বর্ত্তমান সময়ে জৈনসম্প্রদায় বুদ্ধদেবের অহিংসানীতি অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন করিতেছে। প্রাণিহিংসামাত্রই তাহাদিগের নিকট অধর্ম্মের কাজ। কিন্তু, এবিষয়ে তাহাদের মধ্যে কিছু বাড়াবাড়ি দৃষ্ট হয় এবং জৈনদের কতকগুলি আচরণ তাহাদিগকে অপরের নিকট উপহসনীয় করিয়া তুলিয়াছে। এই ত্রুটী সত্ত্বেও ইতর প্রাণীর প্রতি তাহাদের দয়া যারপর নাই প্রশংসার বিষয়। গো

অশ্বাদি গৃহপালিত পশুদিগের ক্লেশ নিবারণের জন্য ইহারা স্থানে স্থানে পিঞ্জরাপোল প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কলিকাতার নিকটে সৈদপুরে এইরূপ একটী পিঞ্জরাপোল আছে। এস্থানে বৃদ্ধ রুগ্ন অকর্ম্মণ্য গরু ঘোড়া প্রভৃতি গৃহপালিত জন্তুসকল আশ্রয় প্রাপ্ত হয়। উহাদের আহার প্রদান এবং চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত আছে। এই পিঞ্জরাপোল স্থাপিত হওয়াতে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তি স্থানের গৃহপালিত পশুগুলির ক্লেশনিবারণের উপায় হইয়াছে। এই সদনুষ্ঠানের জন্য জৈনসম্প্রদায় আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।

অবশ্য এই আপত্তি হইতে পারে যে প্রয়োজনানুসারে কোন কোন জন্তুকে বধ করা নিতান্ত দরকার। বিশেষতঃ সর্প ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্র জন্তুদিগকে বধ না করিলে বিষম অনর্থ ঘটিতে পারে। এরূপ স্থলে জীবহত্যা নিন্দনীয় নহে। এই শ্রেণীর পশুবধে অমঙ্গল অপেক্ষা মঙ্গলের ভাগই অধিক। কিন্তু, লোক-হিতের জন্য পশুপক্ষী বধ করিতে হইবে বলিয়া আমোদ অথবা লোভের জন্য অনর্থক নিরীহ পশুপক্ষীর বধসাধন নিতান্তই দূষণীয়। তার পর পশুপক্ষীকে বধ করিতে হয় কর, কিন্তু বধ করিবার সময় তাহাদিগকে অনর্থক যন্ত্রণা দেওয়া হয় কেন ? বিনা যন্ত্রণায় অতি সহজেইত উহাদিগের বধ সাধন করা যায়। প্রাণি-হত্যা মাত্রই দোষের নহে, অনর্থক যন্ত্রণা দেওয়াই দোষের। সুতরাং হত্যাকালেও যাহাতে প্রাণিগণ অযথা ক্লেশ ভোগ না করে তৎপ্রতি প্রত্যেকেরই দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

অনেকদিন হইতে ইউরোপে বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য জীবন্ত

পশুদেহ-ব্যবচ্ছেদ প্রথা প্রচলিত আছে। বিজ্ঞানের দোহাই দিয়া অতি নৃশংসভাবে পশুপক্ষীগুলিকে যন্ত্রণা দেওয়া হয়। বিষয়টী আজকাল অনেক দয়াদ্র্র মহাত্মার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে এবং তাঁহারা Ante-vivisection Society নামে এক সমিতি স্থাপন করিয়া এই নৃশংস প্রথার তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন। আশা করা যায় ইঁহাদের চেষ্টায় পাশ্চাত্য দেশে পশুজাতির ক্লেশের কতকটা লাঘব হইবে।

আমাদের দেশেও কতিপয় সহৃদয় মহাত্মা পশুদিগের অযথা ক্লেশে ব্যথিত হইয়া পশুক্লেশ নিবারণী সভা (Society for the prevention of cruelty to animals)নামে একটী সমিতি গঠন করিয়াছেন। এই সামিতির নিযুক্ত কর্ম্মচারীগণ রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া পশুদিগের অযথা যন্ত্রণা নিবারণের চেষ্টা করিয়া থাকেন। কোনও গাড়োয়ান অতি বৃদ্ধ রুগ্ন গরু কি ঘোড়া গাড়ী টানিতে ব্যবহার করিলে, অযথা উহাদিগকে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিলে এই সমিতির কর্ম্মচারিগণ উক্ত গাড়োয়ানের নামে ফৌজদারীতে নালিস করিয়া তাহাকে শাস্তি দেওয়ার চেষ্টা করেন। উহাদের কাজের সুবিধার জন্য গবর্ণমেণ্টও উহাদিগকে কতকগুলি বিশেষ ক্ষমতা দিয়াছেন। ঐ ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করিলে উহাদের দ্বারা কলিকাতার পশুক্লেশ কতক পরিমাণে নিবারিত হইতে পারে। কিন্তু পশুক্লেশ নিবারণের পক্ষে এই সামান্য ব্যবস্থা প্রচুর নহে এবং উহা কেবল কলিকাতায় আবদ্ধ থাকা উচিত নয়। যাহাতে এই সমিতির কার্য্য-ক্ষেত্র ক্রমশঃ প্রসার লাভ করিতে পারে তৎপ্রতি সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য।

থার্ম্মাপলির যুদ্ধ।

ইউরোপ মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব্ব অংশে গ্রীস নামে একটী ক্ষুদ্র রাজ্য আছে। অতি প্রাচীন কালে এই গ্রীস শৌর্য্য, বীর্য্য, এবং জ্ঞান-গরিমায় পৃথিবীর মধ্যে অতি উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিল এবং প্রাচীন গ্রীসের দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, এবং শিল্প সাক্ষাৎ এবং পরোক্ষ ভাবে বর্ত্তমান ইউরোপীয় সমাজের গঠনে প্রভূত সাহায্য করিয়াছে।

পুরাকালে এই গ্রীসদেশ কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তন্মধ্যে এথেন্স এবং স্পার্টাই সর্ব্বপ্রধান। এইসকল ক্ষুদ্র রাজ্যে শাসনপ্রণালীর যথেষ্ট বিভিন্নতা ছিল, এবং সময় সময় পরস্পরের মধ্যে বিরোধ এবং আত্মকলহ না ঘটিত এমন নহে। কিন্তু তথাপি তাহাদের মধ্যে অনেক বিষয়ে সাম্য এবং পরস্পরের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতি ছিল। অন্ততঃ বিদেশীয় শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে উহারা আত্মকলহ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সকলে মিলিয়া বিপক্ষ দমনের চেষ্টা করিত। খৃষ্ট পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীর শেষ ভাগে একবার এই প্রকার বিপদের সময় গ্রীক বীরগণ যে শৌর্য্য এবং আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন আজিও তাহা জগতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত আছে।

তখন পারসীকগণের প্রবল প্রতাপ। পারস্যের সম্রাট যে কেবল পারস্যের অধিপতি ছিলেন তাহা নহে, বর্ত্তমান এসিয়া মাইনার, আরব, মিসর প্রভৃতি স্থানেও তাঁহার একাধিপত্য ছিল। সম্রাট জারক্ষস এই বিপুল সাম্রাজ্যের একমাত্র অধীশ্বর।

বহুকালহইতেই ক্ষুদ্র গ্রীসের সহিত পারসীকগণের বিরোধ চলিয়া আসিতেছিল। দশ বৎসর পূর্ব্বে জারক্ষসের পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাট দেরায়স্ বহু সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক গ্রীস আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মারাথনের প্রসিদ্ধ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাহাকে বিফলমনোরথে ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। তদবধি পারস্যরাজ গ্রীকদিগকে নিতান্ত ক্রোধ এবং বিদ্বেষের চক্ষে দেখিতেন এবং কি উপায়ে তাহাদিগকে নির্য্যাতন করা যায় তাহারই উপযুক্ত সুযোগ খুজিতেছিলেন। এই সময়ে গ্রীস দেশের অনেক লোক রাষ্ট্র-বিপ্লবে উপদ্রুত হইয়া পারস্যরাজের আশ্রয়ে বাস করিতেছিল। তাহারা এক্ষণে সুযোগ বুঝিয়া পারস্যরাজকে স্বদেশের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিতে লাগিল।

অবিলম্বে গ্রীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হইল। সমস্ত পারস্য সাম্রজ্য ব্যাপিয়া সাজ সাজ ডাক পড়িয়া গেল। দলে দলে সেনা আসিয়া সার্ডিসে সমবেত হইতে লাগিল। গ্রীসের প্রত্যেক ক্ষুদ্র রাজ্য হইতে বশ্যতার নিদর্শন স্বরূপ মাটী এবং জল আনিবার জন্য দূত প্রেরিত হইল।

এদিকে গ্রীকগণও নিশ্চিন্ত ছিল না। তাহারা বুঝিতে পারিল যে এই জাতীয় যুদ্ধে বিভিন্ন প্রদেশগুলি মিলিত হইয়া সকলে একযোগে বিপক্ষের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান না হইলে একে একে সকলকেই স্বাধীনতা হারাইতে হইবে। অবিলম্বে করিন্থ নগরে এক বিরাট সভা আহুত হইল, গ্রীসের সমস্ত ক্ষুদ্র রাজ্যই এই মহাসভায় আপনাপন প্রতিনিধি প্রেরণ করিল। উক্ত মহাসভায় স্থিরীকৃত হইল যে কিছুতেই বশ্যতা স্বীকার করা হইবে

না, যে প্রকারেই হউক পারসীকগণের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে হইবে এবং এই জাতীয় সমরে প্রত্যেক রাজ্যকেই অর্থ এবং সৈন্য-দ্বারা সাহায্য করিতে হইবে। স্পার্টা এই মহাযুদ্ধের নায়কপদে বৃত হইল। পারস্য হইতে যে সকল দূত মাটী এবং জল সংগ্রহ করিতে আসিয়াছিল তাহাদের দুর্দ্দশার সীমা রহিল না। আথে-নিয়ানগণ দূতকে একটী কূপের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া বলিল যাও এই কূপ হইতে মাটী ও জল গ্রহণ কর।

দূতের এই অপমানে পারস্যরাজ ক্রোধ এবং প্রতিহিংসায় উন্মত্তপ্রায় হইলেন এবং তাঁহার বিপুল সম্রাজ্যের নানা স্থান হইতে প্রধান প্রধান সেনাপতি এবং সৈনিকবর্গকে আহ্বান করিয়া বিপুল অনীকিনীসহ গ্রীসজয়ে যাত্রা করিলেন।

পারস্য হইতে এসিয়া মাইনার হইয়া গ্রীসে যাইতে হইলে বস্‌পোরাস প্রণালী পার হইয়া আসিতে হয়। বস্‌পোরাস প্রণালী পার হওয়ার জন্য তথায় নৌকাদ্বারা এক বিস্তীর্ণ সেতু নির্ম্মিত হইয়াছিল। কথিত আছে এই সেতু পার হইতে পারসীক সৈন্য-গণের সাতদিন সাত রাত্রি অতিবাহিত হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক হিরডটাস অনুমান করেন যে এই মহা অভিযানে পার-সীকগণের সৈন্যসংখ্যা ২০ লক্ষের ন্যূন ছিল না।

বস্‌পোরাস প্রণালী পার হইয়া গ্রীসের অভ্যন্তর-ভাগে প্রবেশ করিতে অনেক দুর্গম গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিতে হয়। এই সকল গিরিবর্ত্মের মধ্যে থার্ম্মাপলির গিরিবর্ত্ম অতি প্রসিদ্ধ।

ইহার একদিকে ইটা নামক পর্ব্বতশ্রেণী আকাশের দিকে মাথা তুলিয়া দণ্ডায়মান, অপর দিকে ইজিয়ান সমুদ্র। এই সমুদ্র এবং

পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে অতি সঙ্কীর্ণ পথ। এই সঙ্কীর্ণ পথের মধ্য দিয়া এক সঙ্গে বহু লোকের যাতায়াত অসম্ভব। কাজেই গ্রীকগণ সর্ব্বাগ্রে এই গিরিপথ রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইলেন।

এই বিপদসঙ্কুল কার্য্যের ভার স্পার্টার রাজা লিওনিডাসের উপর অর্পিত হইল এবং ৩০০ মাত্র স্পার্টান সৈন্য সঙ্গে করিয়া তিনি এই মহাকার্য্য সাধনের জন্য আদিষ্ট হইলেন। অন্যান্য গ্রীক-রাজ্য হইতে দলে দলে সৈন্য আসিয়া লিওনিডাসের সঙ্গে যোগদান করিলেও তাঁহার মোট সৈন্যসংখ্যা ৪০০০ এর অধিক হইল না। এই স্বল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া লক্ষ লক্ষ পারসীক সৈন্যের সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়া কতদূর সাহসের কার্য্য তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। কিন্তু লিওনিডাস কিছুতেই ভয়ে পশ্চাৎপদ হওয়ার লোক ছিলেন না। তিনি মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া, প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া এই অল্পসংখ্যক সৈন্য সঙ্গে স্বদেশের, জন্মভূমির স্বাধীনতা এবং গৌরব রক্ষার্থ থার্ম্মাপলির প্রসিদ্ধ গিরিবর্ত্মে উপনীত হইলেন।

লিওনিডাসের পত্নী গর্গও বীর রমণী ছিলেন। পারসীকগণের আক্রমণোপলক্ষ্যে ইতঃপূর্ব্বে ডেল্‌ফিক মন্দিরে দৈববাণী হইয়াছিল যে স্পার্টার একজন রাজার মৃত্যু না হইলে স্পার্টা রক্ষা পাইবে না। তাই লিওনিডাস আপনার জীবনের বিনিময়ে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। গর্গ একথা শুনিয়াছিলেন, জানিতেন এই ভীষণ সমরক্ষেত্রহইতে তাঁহার হৃদয়দেবতা আর কখনও ফিরিয়া আসিবেন না। কিন্তু তিনি বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইলেন না। প্রফুল্লমুখে স্বামীকে বিদায় দিয়া স্পার্টান রমণীগণের

চিরন্তন প্রথা অনুসারে বলিয়া দিলেন যে হয় ঢালহস্তে না হয় ঢালের উপর ফিরিয়া আসিবে অর্থাৎ হয় বিজয়লক্ষ্মী, নচেৎ মৃত্যুকে বরণ করিবে, কখনও প্রাণ নিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলাইয়া আসিবে না। ধন্য বীররমণীর হৃদয়!

জারক্ষস থার্ম্মাপলিতে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলেন যে সামান্য একদল গ্রীক সেনা তাহার বিপুল বাহিনীর গতিরোধ করিতে প্রস্তুত হইয়াছে। এপ্রকার উদ্যমকে তিনি পাগলের চেষ্টা বলিয়া মনে করিলেন এবং একজন পারসীক সৈন্যকে বিপক্ষের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণার্থ পাঠাইয়া দিলেন। গুপ্তচর আসিয়া রাজ-সমীপে নিবেদন করিল যে গ্রীকগণের মধ্যে কেহ কেহ মল্লক্রীড়া করিতেছে আর কেহ কেহ আপনাদের কেশ বিন্যাস করিতেছে। এই সংবাদে নিতান্ত বিস্মিত হইয়া উহার মর্ম্ম অবগত হইবার জন্য নিকটবর্ত্তী একজন গ্রীককে জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তরে জানিতে পারিলেন যে স্পার্টানগণ অত্যন্ত নিঃশঙ্কহৃদয়। যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে কেশ-বিন্যাস করিবার প্রথা তাহাদের মধ্যে বহুকাল হইতে প্রচলিত। কিন্তু সম্রাট কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না যে মুষ্টিমেয় একদল সৈন্য কিপ্রকারে তাহার গতিরোধ করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইতে পারে। তিনি চারিদিন তথায় অপেক্ষা করিলেন, কিন্তু গ্রীকগণ কিছুতেই যখন তাহাদের স্থান পরিত্যাগ করিল না তখন তাহার বিপুল সৈন্যদলকে অগ্রসর হওয়ার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন।

যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দলে দলে পারসীক সেনা ঐ সঙ্কীর্ণ গিরি-পথ দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই গ্রীকসৈন্য ভেদ

করিয়া অপর প্রান্তে উত্তীর্ণ হইতে পারিল না। জারক্ষস নিরাপদ স্থানে সিংহাসনে উপবেশন করিয়া যুদ্ধ দেখিতেছিলেন এবং পুনঃ পুনঃ আপনার সৈন্যদিগের পরাভব দর্শনে ভগ্নহৃদয়ে তিনবার সিংহাসন হইতে লাফাইয়া উঠিয়াছিলেন। তিন দিবস ক্রমাগত যুদ্ধ চলিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। সেই অমিততেজাঃ, নির্ভীক হৃদয় বীর লিওনিডাস আপনার অল্পসংখ্যক সৈন্য সঙ্গে সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্মের এক প্রান্তে অটল পর্ব্বতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। পঙ্গপালের ন্যায় সৈন্যশ্রেণী ক্রমাগত আসিয়া আক্রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই তাহাদিগকে স্থানচ্যুত করিতে পারিল না।

বিপক্ষের অগণিত সেনাসমূহ যাহা করিতে পারিল না, অবশেষে বিশ্বাসঘাতকতা তাহা সম্পাদন করিল। তৃতীয় দিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে এফিয়াল্টিস নামক একজন স্বজাতিদ্রোহী গ্রীক পারস্য-সম্রাটের শিবিরে উপস্থিত হইয়া বহু অর্থের বিনিময়ে পারসীক-দিগকে পর্ব্বতের উপরিস্থিত একটী গুপ্ত পথ দেখাইয়া দিল। এই গুপ্ত পথটী গ্রীকদিগের জানা ছিল বটে, কিন্তু পারসীকগণ তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিত না। জারক্ষস তৎক্ষণাৎ হাইড্রেন নামক সেনাপতিকে একদল সৈন্য সহ পথপ্রদর্শক ঐ বিশ্বাস-ঘাতকের সঙ্গে পর্ব্বতের উপরিস্থিত গুপ্ত পথে অপর প্রান্তে অবতরণপূর্ব্বক গ্রীক সৈন্যের পশ্চাৎভাগ আক্রমণ করিতে আদেশ প্রদান করিলেন।

ঊষার অরুণ রাগে যখন পূর্ব্বাকাশ রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছিল তখন গ্রীকেরা দেখিতে পাইল যে পর্ব্বতের উপর হইতে একদল সৈন্য নীচের দিকে নামিয়া আসিতেছে। তাহাদের রৌপ্যখচিত

সমরবেশ সূর্য্যকিরণে প্রতিফলিত হইয়া স্ফটিকের ন্যায় উজ্জ্বল দেখাইতেছিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে গ্রীকেরা বুঝিতে পারিল যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত। হয় ত কোন বিশ্বাসঘাতক অর্থলোভে পার্ব্বত্য গুপ্ত পথটী শত্রুর নিকট প্রকাশ করিয়াছে, অচিরেই সম্মুখে এবং পশ্চাৎভাগে অগণিত পারসীক কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া তাহাদিগকে নশ্বর মানব দেহ ত্যাগ করিতে হইবে।

কিন্তু এই অভাবনীয় বিপদেও লিওনিডাস ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন না। পার্ব্বত্য বন্ধুর পথ অতিক্রম করিয়া পারসীক সৈন্যগণের নিম্নে অবতরণ করিতে তখনও কিছু সময় অবশিষ্ট ছিল। লিওনিডাস তাড়াতাড়ি একটী সৈনিক সভা আহ্বান করিলেন এবং সমবেত সেনাবৃন্দের নিকট আপনাদের আসন্ন বিপদ স্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন যে অগণিত শত্রুসেনাকর্ত্তৃক যুগপৎ সম্মুখ এবং পশ্চাৎভাগে আক্রান্ত হইলে তাহাদের একটী লোকেরও গৃহে ফিরিয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। এরূপ অবস্থায় অনর্থক জীবন বিসর্জ্জন দেওয়া কোনরূপেই সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। কাজেই তিনি অন্যান্য গ্রীকদিগকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে উপদেশ দিলেন, কিন্তু নিজে ৩০০ স্পার্টান সৈন্যসহ সেস্থানে দাঁড়াইয়া শেষপর্য্যন্ত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

অন্যান্য গ্রীকদিগের মধ্যে ৭০০ থেস্পিয়ান ব্যতীত আর সকলেই গৃহে ফিরিয়া যাইতে সম্মত হইল। থেস্পিয়ানগণ কিছুতেই লিওনিডাসকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে চাহিলেন না। লিওনিডাসের দুই জন আত্মীয় তাঁহার সঙ্গে ছিল। তাহাদিগকে উপস্থিত বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য দুই খানা পত্র দিয়া

স্পার্টায় পাঠাইবার সংকল্প করিলেন। কিন্তু তন্মধ্যে একজন বলিলেন তিনি যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন পত্রবাহকের কার্য্য করিতে আসেন নাই। দ্বিতীয় ব্যক্তি উত্তর করিলেন যে স্পার্টানগণ পত্রের পরিবর্ত্তে তাহাদিগের কার্য্যদ্বারাই সকল সংবাদ অবগত হইবে।

লিওনিডাস এতক্ষণ আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতেছিলেন, কিন্তু যখন দেখিলেন মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী তখন যত অধিক-সংখ্যক পারসীককে যমালয়ে প্রেরণ করিতে পারেন ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল। তাই তিনি পূর্ব্ব স্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক পারসীক-গণকে সম্মুখ হইতে আক্রমণ করিলেন। সে আক্রমণের বেগ সহ্য করা পারসীকগণের পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। দলে দলে শত্রুসেনা প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। কিন্তু লক্ষ লক্ষ পারস্য সেনার নিকট মুষ্টিমেয় গ্রীকসৈন্য কতক্ষণ টিকিয়া থাকিতে পারে? ক্রমে তাহাদের সংখ্যা ক্ষীণ হইতে লাগিল। এমন সময় সংবাদ আসিল যে শত্রুগণ তাহাদিগকে পশ্চাৎভাগেও আক্রমণ করিয়াছে। তখন গ্রীকগণ সম্মুখস্থ একটী ক্ষুদ্র উচ্চ ভূমির উপর আরোহণ করিয়া সেইখানেই আপনাদের অমূল্য জীবন বিসর্জ্জন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু এই শেষ মুহূর্ত্তে থিবানগণের সাহস তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিল। নিতান্ত ভীত হইয়া তাহারা পারস্য সম্রাটের নিকট অভয় প্রার্থনা করিল। স্পার্টানগণ তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিল না। অচল অটল পর্ব্বতের ন্যায় সেই উচ্চ ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য প্রফুল্লচিত্তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিল।

এই শেষ যুদ্ধের অবসান হওয়ার পূর্ব্বেই লিওনিডাস প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। অত্যাচারী জারক্ষস তাহার হস্ত এবং মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একটি ক্রসের উপর প্রোথিত করিয়াছিলেন এবং ঐ রণক্ষেত্রেই মৃত গ্রীকবীরদিগকে সমাহিত করা হইয়াছিল।

ইহার কিছুদিন পরে প্লেটিয়ার যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পারসীকগণ গ্রীস পরিত্যাগ করিলে পর থার্ম্মাপলির যুদ্ধে নিহত গ্রীকগণের স্মৃতি-রক্ষার্থ ঐ গিরিবর্ত্মের সন্নিকটে কতিপয় স্মৃতি-স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়। স্পার্টানগণের স্মৃতি-স্তম্ভের একদেশে নিম্নলিখিত কবিতাটী উৎকীর্ণ হইয়াছিল—

যাওহে পথিকবর
বলিও স্পার্টানগণে,
তাদেরি আজ্ঞায় মোরা
রয়েছি চির-শয়নে।

বহুদিন হয় এই সকল স্মৃতি-স্তম্ভ এবং প্রস্তর-লিপি ধরণী-পৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া গিয়াছে। এমন কি থার্ম্মাপলি গিরিবর্ত্মের প্রাকৃতিক দৃশ্যেরও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে। ইটা পর্ব্বত এবং ইজিয়ান সাগরের মধ্যে নূতন ভূমি উৎক্ষিপ্ত হইয়াছে। কিন্তু প্রস্তর অথবা লৌহ অপেক্ষাও অধিকতর স্থায়ী লিওনিডাসের নাম আজও গৃহে গৃহে ধ্বনিত হয়। যে দিন সে মহাবীর স্বদেশের কল্যাণার্থ থার্ম্মাপলির গিরিবর্ত্মে দাঁড়াইয়া অগণিত শত্রু-সেনার সম্মুখে আপনার প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন সেই স্মরণীয় দিনের পবিত্র স্মৃতি আজও কত বীরহৃদয়ে আশা এবং

উৎসাহ জাগাইয়া তুলিতেছে এবং যতকাল এই পৃথিবীতে বীরত্বের গৌরব থাকিবে ততকাল লিওনিডাসের নাম কখনও লুপ্ত হইবে না ।

সক্রেটীস

এই জগতে যে সকল মহাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া অত্যুজ্জ্বল প্রতিভা ও অতুলনীয় চরিত্রগৌরবে অনন্তকালের জন্য কীর্ত্তির রেখা অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন সক্রেটীস সেই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ-দিগের মধ্যে অন্যতম । তিনি বিদেশবাসী হইলেও আমাদের পরমাত্মীয় । তাঁহার ধর্ম্মপ্রবণ আদর্শ জীবন জগতের সাধারণ সম্পত্তি ।

গ্রীস দেশের অন্তর্গত এথেন্স নগরে আনুমানিক ৪৬৯ খৃঃ পূর্ব্বে এই মহাত্মার জন্ম হয় । ইঁহার পিতার নাম সফরনিস্কাস । ইনি ভাস্করশিল্পীর কার্য্য করিতেন । তাহাতে যাহা আয় হইত তদ্দারা তাঁহাদের জীবিকানির্ব্বাহ হইত । ইহা ব্যতীত সক্রেটীসের জননী ধাত্রীর কার্য্য করিয়া কিছু উপার্জ্জন করিতেন। তাহাতে তাঁহাদের সংসারের অনেক আনুকূল্য হইত ।

যথাসময়ে গ্রীস দেশের প্রথানুসারে সক্রেটীসকে বিদ্যালয়ে পাঠান হইল । তিনি সঙ্গীত, ব্যায়াম, জ্যামিতি ও জ্যোতিস্ প্রভৃতি তৎকালীন অবশ্য জ্ঞাতব্য শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন । ইহা ব্যতীত তৎকালীন পণ্ডিতদিগের লিখিত প্রবন্ধাদি

যত্নের সহিত পাঠ করিয়া এবং তাঁহাদের শাস্ত্রমত ইত্যাদি আলোচনা করিয়া প্রভূত জ্ঞান অর্জ্জন করেন।

যৌবনের প্রারম্ভে তিনি পিতার ন্যায় ভাস্করশিল্পীর কার্য্য করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হন এবং নিজ প্রতিভা ও অধ্যবসায়বলে অতি অল্প দিনের মধ্যেই স্বীয় ব্যবসায়ে বিশেষ উন্নতি লাভ করেন।

কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল ভাস্করের কার্য্য করিতে পারেন নাই। এই ব্যবসায় তাঁহার ভাল লাগিল না। যে সুমহৎ কার্য্যসাধনের জন্য বিধাতা তাঁহাকে এ সংসারে পাঠাইয়াছিলেন সেই কার্য্যের সুমঙ্গল আহ্বান তাঁহার হৃদয়ে আসিয়া পৌঁছিল। আর তিনি স্থির থাকিতে পারিলেন না। ভাস্করের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তিনি লোক-শিক্ষা-রূপ মহান্ ব্রত গ্রহণ করিলেন এবং যতদিন এই মরজগতে বাঁচিয়াছিলেন এক মুহূর্ত্তের নিমিত্তও স্বীয় ব্রত হইতে তিলমাত্রও বিচলিত হন নাই।

প্রচলিত প্রথা অনুসরণ করিয়া তিনি কখনও শিক্ষাদান করিতেন না। যেখানে যাহার অজ্ঞান ও ভ্রান্তি দেখিতে পাইতেন কথোপকথনচ্ছলে, সু-যুক্তির সহায়তায় সেই অজ্ঞান ও ভ্রম দূর করিয়া দিতেন। অভিমান-দীপ্ত শিক্ষকরূপে তিনি কোথাও কাহারও কাছে উপস্থিত হইতেন না। শিক্ষার্থীর বেশে উপস্থিত হইয়া সরলভাবে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন। তাঁহার সু-যুক্তি এবং আড়ম্বরবিহীন বিচারের নিকট সকলকেই পরাজয় স্বীকার করিতে হইত। বিপক্ষের উত্তেজনাপূর্ণ বাক্যবাণে শতবার বিদ্ধ হইয়াও, স্থূলবুদ্ধি প্রতিদ্বন্দ্বীর অসার বাক্যজালে পরিবেষ্টিত

হইয়াও মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিত না, প্রসন্ন মুখচ্ছবিতে বিরক্তির ঘন ছায়া একবারও পড়িত না। আনন্দের সহিত বিপক্ষের কূট তর্কজাল অকাট্য যুক্তির দ্বারা ছিন্ন করিয়া ফেলিতেন এবং তাহাদের মনের সকল প্রকার অজ্ঞান-তিমির বিনাশ করিয়া ধর্ম্ম ও জ্ঞানের শুভ্র আলোক বিস্তারিত করিয়া দিতেন।

ক্রমে বহুলোক তাঁহার শিষ্য-শ্রেণীভুক্ত হইল। অনেক যুবক এই মহাজ্ঞানী, সরলপ্রাণ যোগীর অনুবর্ত্তী হইয়া নিজ নিজ জীবনকে উন্নত করিতে লাগিল। শত শত জীবনে সক্রেটীসের সু-প্রভাব বিস্তারিত হইতে লাগিল। যাঁহারা তাঁহার দেবত্বে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার শিষ্য-শ্রেণীভুক্ত হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে জগৎবিখ্যাত "প্লেটো" একজন। তিনি গুরুর প্রিয় শিষ্য এবং তাঁহার দেহত্যাগ পর্য্যন্ত নিত্যসহচর ছিলেন এবং উত্তরকালে স্বীয় গুরুর মাহাত্ম্য জগৎসমক্ষে বিশেষভাবে প্রচারিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

দেশের রীতি অনুসারে সক্রেটীস কিছুদিন সৈনিকের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া স্বদেশের সেবা করিয়াছিলেন। সেই সময় সাহসিকতা ও অসাধারণ কষ্টসহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি গভীর নিষ্ঠা ও একাগ্রতার সহিত দেশের সেবা করিতেন। সকল কার্য্যেই তাঁহার সমগ্র শরীর ও মন ঢালিয়া দিতেন। যদি রাজনৈতিক ক্ষমতা ও খ্যাতি অর্জ্জন করাই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য হইত তবে তিনি সে দিকে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিতে সক্ষম হইতেন। কিন্তু

সে ইচ্ছা তাঁহার দেবত্বচিহ্নিত প্রাণে কখনই স্থান পায় নাই। তিনি পার্থিব মান, মর্য্যাদা, খ্যাতি ও প্রতিপত্তির ধার ধারিতেন না। কি করিলে দেশের কল্যাণ হইবে, সকল লোক অধর্ম্ম ও দুর্নীতির পথ পরিত্যাগ করিয়া, পবিত্র ধর্ম্ম ও নীতির পথ অনুসরণ করিবে এই চিন্তায় ও কার্য্যে অহর্নিশ নিযুক্ত থাকিতেন।

সৈনিকের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে থাকিতেই অন্তরের মধ্যে কি এক আকাশবাণী শুনিতে পাইলেন। কুটিল রাজনীতির বিষম জালে পড়িও না; নিজ ব্রত ভুলিয়া বিপথগামী হইও না। সক্রেটীস রাজনীতি হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং অনন্যকর্ম্মা ও অনন্য-চিত্ত লইয়া লোক-শিক্ষাতেই মনোনিবেশ করিলেন। সংসারে থাকিয়া সন্ন্যাসী হইলেন।

তিনি কিছুদিন "সিনেট" সভার সদস্যরূপে দেশের কার্য্য করিয়াছিলেন। সেই পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াও তিনি অক্ষুণ্ণ ভাবে সত্য ও ন্যায়ের সেবা করিতে ত্রুটী করেন নাই। তাঁহার যে অসাধারণ নির্ভীকতা সৈনিকের দুরূহ কার্য্যে দক্ষতা দান করিয়াছিল, যে সাহস উত্তরকালে তাঁহাকে অম্লানচিত্তে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে সাহায্য করিয়াছিল সেই সৎসাহস ও ধর্ম্ম-ভীরুতাই তাঁহাকে "সিনেট সভার" সভ্যের গুরুতর কার্য্যে নিত্য ধর্ম্মপথাবলম্বী ও ন্যায়দর্শী করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

"ত্রিশের শাসন-বিভীষিকা" নামক গ্রীস দেশের অবিচার-বহুল বিখ্যাত শাসন সময়ে তিনি দুর্ম্মতি শাসনকর্ত্তাদিগকে অমান্য করিয়া নিজ বিবেকের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার মানসিক তেজের তুলনা হয় না। ইহাতে তাঁহার শত্রু-

সংখ্যা বাড়িয়া গিয়াছিল, কিন্তু সেই সৎ-সাহসসম্পন্ন বীরের চিত্ত তিলমাত্রও তাহাতে বিচলিত হয় নাই।

শত্রুকুল কিছুদিন তাঁহার বিশেষ কোনও অনিষ্ট করিয়া উঠিতে পারে নাই, কিন্তু কিছুকাল পরে তাহাদের দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হইল। সক্রেটীসের নামে গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিয়া তাঁহাকে রাজদ্বারে আনয়ন করা হইল।

অভিযোক্তাদের মধ্যে অনেক গণ্যমাণ্য লোক ছিল। ইহারা রাজনীতি ক্ষেত্রে তাঁহার ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল এবং অন্তরে অন্তরে সক্রেটীসের উপর বৈরভাব পোষণ করিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশ সাধন করিতে যথাসাধ্য যত্নপরায়ণ হইয়াছিল।

তাহারা অভিযোগ করিল সক্রেটীস দেশের পরম শত্রু—দেশের নীতিজ্ঞান ধ্বংসকারী। রাজ্যের সকল লোক যে দেবতা-দিগকে মান্য করে, পূজা করে, সক্রেটীস তাহাদিগকে গ্রাহ্য করেন না। তিনি তাঁহাদিগের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস বিহীন, তিনি কি এক অদ্ভুত ও অরূপ দেবতার কল্পনা করিয়া দেশের সকল সরল লোকের মতিভ্রান্তি জন্মাইয়া দিতেছেন। তরুণ-মতি বালক ও যুবকগণ তাঁহার বাক্যমোহে পড়িয়া বিপথগামী হইতেছে। সংক্ষেপে সক্রেটীস দেশের শত্রু, দেবতার শত্রু ও যুবকগণের সর্ব্বনাশের একমাত্র কারণ ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই দারুণ অভিযোগ শ্রবণ করিয়া তিনি বিচলিত হইলেন না। যাহাদের সন্তানগণের মঙ্গল সাধন করিবার জন্য তিনি দেহ, মন ও প্রাণ অর্পণ করিয়াছেন, সংসারে আসিয়া সন্ন্যাসী

হইয়াছেন তাহাদের এই অমানুষিক অকৃতজ্ঞতা দেখিয়া তিনি তাহাদের প্রতিও রুষ্ট হইলেন না।

সক্রেটীস বিচারালয়ে নীত হইলেন। বিচার শুনিবার জন্য লোকে লোকারণ্য হইল। বিচারকগণের সম্মুখে তিনি স্বাভাবিক ধীরতার সহিত জলদগম্ভীর স্বরে একটি বক্তৃতা প্রদান করিলেন। অকাট্য যুক্তির দ্বারা অভিযোক্তাদের অন্যায় অভিযোগের অসারতা সুস্পষ্ট বুঝাইয়া দিলেন। সর্ব্বশেষে এই বলিলেন, তাঁহার কার্য্যকলাপের জন্য এথেন্সবাসীগণ কই কোথায় না তাঁহাকে পুরস্কৃত করিবে তাহা না করিয়া তাঁহাকে অন্যায় ভাবে শাসন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে।

একদর্শী বিচারকগণ কিন্তু ন্যায় ও যুক্তির মর্ম্ম বুঝিতে পারিল না। অধিকাংশ বিচারকের মতে সক্রেটীস দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন। তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইল। হাসিতে হাসিতে তিনি সেই আদেশ গ্রহণ করিলেন। তিনি বলিলেন "ভালই হইল। এইবার দেখা যাইবে মৃত্যু একটি স্বপ্নবিহীন নিদ্রাবস্থা কি না এবং প্রেতলোকগত বীর ও ঋষিদিগের জ্ঞান ইত্যাদি পর্য্যবেক্ষণ করিবার চমৎকার সুযোগ পাওয়া যাইবে"।

তাঁহাকে কারাগারে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে তিনি ৩০ দিন ছিলেন। "ক্রাইটো" নামক তাঁহার জনৈক বন্ধু একদিন তাঁহাকে বলিলেন "আমরা সব বন্দোবস্ত করিয়াছি, আপনি নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করুন"। তিনি হাসিয়া বলিলেন "ভাই, তুমি বলিতে পার কোথায় যাইয়া, আমি সত্য সত্যই প্রাণকে চিরদিন রক্ষা করিতে পারিব, মৃত্যু কখনও

যেখানে আমায় আক্রমণ করিতে পারিবে না? যদি মৃত্যুর করাল গ্রাস হইতে রক্ষা পাইতে না পারিলাম, তবে আর শুধু দুদিনের জন্য কেন কাপুরুষতার ছাপ নামের অঙ্গে রাখিয়া যাইব"। তিনি আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে শেষ কথা শিষ্যদিগকে শুনাইয়া নির্দ্দিষ্ট দিনে আনন্দের সহিত 'হেমলক' নামক আশু প্রাণধ্বংশকারী তীব্র হলাহল পান করিলেন। ক্ষণেকে দেহ অসাড় হইয়া গেল, এবং সেই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ সকল প্রকার অন্যায় ও অসত্যের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া অমরধামে চলিয়া গেলেন। কিন্তু অত্যুজ্জ্বল প্রতিভা, নির্ম্মল চরিত্র-গৌরব ও স্বার্থত্যাগের যে মহতী কীর্ত্তিরেখা এ জগতে রাখিয়া গেলেন তাহা চিরদিন মোহাসক্ত মানুষকে পবিত্রতা ও দেবত্বের দিকে আকর্ষণ করিবে।

সক্রেটীসের শারীরিক সৌন্দর্য্য মাত্রই ছিল না। তিনি অতিশয় কদাকার পুরুষ ছিলেন। সেই কুৎসিৎ দেহের মধ্যে কি এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময় আত্মাই নিহিত ছিল। তিনি ভগবানের আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া সকল কার্য্য করিতেন; ন্যায়ের কঠোর শাসনে নিজের প্রত্যেক কাজকে নিয়মিত করিতেন। জীবনে, বাক্যে, চিন্তায় ও কার্য্যে কখনও কাহারও অনিষ্ট করেন নাই।

আহারে ও বিহারে কঠোর সংযম অবলম্বন করিয়া চলিতেন। সুখের লালসায় কখনও সংযমকে অতিক্রম করেন নাই। সামান্য আয়ে তাঁহার সকল অভাব পূরণ হইয়া যাইত। সকল ঋতুতেই তিনি নগ্নপদে একটি মাত্র গাত্রাবরণে নগরের সর্ব্বত্র বিচরণ

করিতেন। চিরপ্রসন্ন বদন-মণ্ডলে কেহ কখনও দুশ্চিন্তার কাল-ছায়া দেখিতে পায় নাই।

একদিকে যেমন সংযম ও তপস্যার কঠিন নিয়মে নিজেকে শাসিত করিতেন অপর দিকে তেমনি সামাজিক সর্ব্বপ্রকার নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদে যথারীতি যোগদান করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না। নিজের প্রবল ইচ্ছা-শক্তির সহায়তায় সর্ব্বপ্রকার আতিশয্য হইতে নিজকে রক্ষা করিতে সর্ব্বদাই সক্ষম হইতেন।

অবসর পাইলেই নগ্নপদে সহরের জনতাপূর্ণ স্থানসমূহে বিচরণ করিতেন এবং যেখানে দশজন বসিয়া আছেন সেইখানে গিয়া সকলের কথায় যোগদান করিতেন এবং ক্রমে কথায় কথায় সকলকে এক আশ্চর্য্য পবিত্র ও সুন্দর ভাবদ্বারা মোহিত করিয়া ফেলিতেন। তাঁহার কথার এমনই একটা আশ্চর্য্য শক্তি ছিল যে যে সেই কথা শুনিত অলক্ষিত ভাবে সেই একটু পবিত্রতা ও সুনীতির দিকে আকৃষ্ট হইত। তিনি শুষ্কজ্ঞান দার্শনিকের কল্পনা ও জল্পনাকে ততটা শ্রদ্ধা করিতেন না। কিন্তু সহজ ও সরল সত্যগুলি এমনই সুন্দর ভাবে সকলের সমক্ষে ধরিতেন যে তাহাতে সকলেই মুগ্ধ হইয়া যাইত।

সকল প্রকার ভ্রম ও কুসংস্কার নিরসন করাই তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য ছিল। তিনি নির্জ্জন প্রান্তরে কিম্বা লোক-সমাগম-শূন্য স্থানে যাইয়া প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া চিত্তের তৃপ্তি সাধন করিতে চাহিতেন না, কলকোলাহলময় সহরের জনতাপূর্ণ স্থান সকলে বিচরণ করিয়া মানবচরিত্র অধ্যয়ন করিতে অধিক ভালবাসিতেন।

সক্রেটীস তাঁহার জন্মভূমিকে কি গভীর প্রেমের চক্ষেই দেখিতেন! জন্মভূমির প্রতি ধূলিকণা তাঁহার নিজ হৃদয়ের শোণিতবিন্দুর মত প্রিয় ছিল। স্বদেশের নরনারীকে তিনি এত ভালবাসিতেন যে কোন স্নেহময়ী জননীও নিজ সন্তানকে এত ভালবাসিতে পারে না। প্রত্যেকটি আত্মা তাঁহার কতই না আদরের জিনিষ ছিল! সেই আত্মার কল্যাণ কামনায় তিনি কোন প্রকার শ্রমকেই শ্রম বলিয়া মনে করিতেন না। পরিশেষে নরনারীর সেবা করিতে যাইয়া নিজের প্রাণপর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না।

সক্রেটীস একদিকে যেমন গম্ভীর-প্রকৃতি, নীতিপরায়ণ, ধার্ম্মিক অপর দিকে তেমনই সুরসিক ও হাস্যপরিহাসপ্রিয় ছিলেন। এই মহৎগুণবিশিষ্ট হওয়াতেই তাঁহার চিত্ত সকল প্রকার বাধা ও বিঘ্নের মধ্যেও স্বাভাবিক প্রসন্নতা হারায় নাই; কত লোক তাঁহাকে পাগল বলিত, কত বিদ্রূপ, কত উপহাসের বিষ-শলা তাঁহার উপর বর্ষিত হইত, তিনি হাসিয়া সব উড়াইয়া দিতেন। নিন্দা, অপমান ও লাঞ্ছনায় পর্ব্বতের মত অচল অটল থাকিয়া প্রতি নিয়ত স্বীয় কর্ত্তব্যের আলোক দেখিয়া চলিতেন। বাহিরের কোনও প্রকার মতামতের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করিতেন না।

সক্রেটীসের পারিবারিক জীবন সুখের ছিল না। তাঁহার পত্নী জগৎবিখ্যাতা "জান্টীপি" নিতান্ত কোপনস্বভাবা নারী ছিলেন। তাঁহার রসনা সর্ব্বদাই তীক্ষ্ণ কটূক্তি ও অপমানের তীব্র হলাহল উদ্গীরণ করিত। স্বামীর প্রতি তাঁহার নিদারুণ অত্যাচার ও অপমানের অনেক কৌতুকপূর্ণ কাহিনী প্রচলিত

আছে। সক্রেটীস যে অমানুষিক ধীরতাবলে বাহিরের শত শত লাঞ্ছনার শক্তিকে পরাভূত করিয়াছিলেন সেই সহিষ্ণুতা প্রভাবেই গৃহের অত্যাচার ও অশান্তিকেও দমন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রগণ সম্বন্ধেও এরূপ কথিত আছে যে তাহারা নিতান্তই স্থূলবুদ্ধি, অপরিণামদর্শী ও অলস হইয়াছিল। এই প্রকার নানা অন্তরায়ের মধ্যে থাকিয়াও সেই স্থিরমতি ঋষির চিত্তের কোন রূপ চপলতা জন্মে নাই, সহিষ্ণুতার বিলোপ ঘটে নাই।

সুবিখ্যাত "ডেলফিক্" বাণী তাঁহাকে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিল। সক্রেটীস সেই অমর বাণীর এই প্রকার ব্যাখ্যা করিতেন—আমি পরের চেয়ে জ্ঞানী কিসে বুঝিতেছি, না, আমার ত দোষ ক্রুটী অনেক আছে। তবে এই ভাবে হয় ত হ'তে পারি যে ওরা যে কিছু জানে না তাহা ওরা বুঝিতে পারিতেছে না; আমি যে জানি না তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি।

সক্রেটীস নিজের অনেকরূপ অপূর্ণতা ও দোষের উল্লেখ করিয়া সর্ব্বদাই বিনীত থাকিতেন এবং যথাসাধ্য সেইগুলির সংশোধনের চেষ্টা করিতেন। তাঁহার ধর্ম্মপ্রাণতা, সত্যনিষ্ঠা এবং সৎসাহস জগতে অতুলনীয়।

সংসর্গ।

মনুষ্যের আসঙ্গলিপ্সা অতি প্রবল। সে কখনও একাকী থাকিতে পারে না। একাকী থাকা তাহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ এবং কখনও ঘটনাক্রমে একাকী পড়িলে তাহার প্রাণ ছটফট্ করিতে থাকে। কি প্রকারে অপরের নিকট যাইয়া আলাপাদি করিবে এবং নিজ সুখ দুঃখের কথা জানাইয়া তাহার সহানুভূতি লাভ করিবে তজ্জন্য ব্যাকুল হয়। নির্জ্জনবাস সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর পক্ষে উপযোগী হইতে পারে, কিন্তু সাধারণ মানবের পক্ষে মনুষ্য-সংসর্গহীন স্থানে বাস করা অসম্ভব।

এই স্বাভাবিক বৃত্তিদ্বারা প্রণোদিত হইয়া মানুষ সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করে। সমাজে বাস না করিলে তাহার পক্ষে বাঁচিয়া থাকাই কঠিন হইত। একদিকে বাহিরের শত্রু হইতে আত্ম-রক্ষার জন্য দলবদ্ধ হইয়া বাস করা প্রয়োজন, অপরদিকে অন্যের সাহায্য ব্যতীত কোন লোকই টিকিয়া থাকিতে পারে না। প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতিপদবিক্ষেপে মানুষকে অপরের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। মানুষের ভাষা, মানুষের শিক্ষা এবং সভ্যতা—যাহা কিছু মানুষের নিজস্ব, যাহা কিছু গৌরবের জিনিষ—সমস্তই সমাজবদ্ধ মানবের সম্মিলিত চেষ্টার ফল। সমাজবিচ্যুত মানুষ মানুষই নহে, উহা পশুরই অবস্থান্তর মাত্র।

ব্যক্তিগত হিসাবে বিবেচনা করিলেও দেখা যাইবে যে প্রত্যেক ব্যক্তির শিক্ষা, চরিত্র প্রভৃতি সম্পূর্ণরূপে তাহার নিজস্ব নহে। অবশ্য, জ্ঞানের বীজ প্রথম হইতেই হৃদয়ে নিহিত ছিল,

কিন্তু তাহার কোনও বিশেষত্ব ছিল না। সে জ্ঞান জ্ঞানই নহে, উহা জ্ঞানলাভের প্রচ্ছন্ন শক্তি মাত্র। মানুষের শিক্ষা, চরিত্র, এক কথায় মানুষের মনুষ্যত্ব সমাজ হইতে প্রাপ্ত। কিন্তু প্রথম অবস্থায় যে সমাজে তাহার শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে তাহা বিস্তীর্ণ মানবসমাজ নহে। পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন এবং প্রতিবাসী প্রভৃতি যাহাদের মধ্যে প্রতিপালিত হইয়া সে জ্ঞানে চরিত্রে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়াছে উহারাই তাহার সমাজ।

শিশুকালে পিতামাতা এবং পরিবারস্থ অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের নিকট আমাদের শিক্ষার আরম্ভ হয়; তার পর বয়স্থ হইলে বিদ্যালয়ে শিক্ষকের নিকট শিক্ষালাভ করি। পিতামাতা আমাদিগকে সদুপদেশ দেন, শিক্ষক আমাদের চরিত্রোন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। কিন্তু এই সাক্ষাৎ উপদেশ আমাদের চরিত্রগঠনে বিশেষ সাহায্য করে বলিয়া বোধ হয় না।

চরিত্রগঠন বিষয়ে উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্তের প্রভাব অনেক বেশী। আমরা যাহা শুনি তাহা সহজেই ভুলিয়া যাই, কিন্তু যাহা দেখি তাহা অনেক সময় হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া থাকে। অনেক স্থলেই মানুষ অপরের অনুকরণ করিয়া শিক্ষা লাভ করে। বাল্যকালে এই অনুকরণ প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল থাকে। বালক যাহা কিছু শিখে প্রায় সমস্তই অন্যের অনুকরণে। সে চলিতে শিখে অন্যকে হাটিতে দেখিয়া, কথা বলিতে শিখে অন্যের কথা শুনিয়া। কাযেই অন্যের চরিত্র দেখিয়াই বালকের চরিত্র গঠিত হইতে আরম্ভ হয়।

কিন্তু আমরা সমবয়স্ক লোকের যেরূপ অনুকরণ করিয়া

থাকি ভিন্নাবস্থ লোকের সেরূপ অনুকরণ করিতে পারি না। কারণ সমবস্থ লোকের মধ্যে অভাব ও আকাঙ্ক্ষার সাম্যবশতঃ সহানুভূতি বেশী হয়, এবং পরস্পারের সহানুভূতিতে পরস্পারের শিক্ষালাভ হয়। এ জন্যই অপরিণতবুদ্ধি বালকগণ তাহাদের পিতামাতার কি শিক্ষকের আচরণ অনুকরণ না করিয়া সমবয়স্ক সঙ্গীদের আচরণই অনুকরণ করিয়া থাকে। বিদ্যালয়ে শিক্ষক হইতে প্রধানতঃ বিদ্যালাভ হয়, চরিত্রগঠন হয় সমপাঠিগণের মধ্যে। শিক্ষকের সঙ্গে দিবসে অতি অল্প সময়ই সাক্ষাৎ হয়, তাহাও প্রায়শঃ বিদ্যাচর্চ্চায় অতিবাহিত হয়। শিক্ষকমণ্ডলীর কার্য্যাবলি দেখিয়া চরিত্রগঠনের সুবিধা অনেকেরই ঘটিয়া উঠে না। বিশেষতঃ বালকের মানসিক অবস্থা পরিণতবয়স্ক ব্যক্তির মানসিক অবস্থা হইতে অনেকটা বিভিন্ন। পরিণতবয়স্কের চিন্তা ও কার্য্যাবলি বালকের হৃদয় আকর্ষণ করিতে পারে না, পক্ষান্তরে বালকের আশা এবং আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধের হৃদয়ে স্থান পায় না। কাযেই সহানুভূতির অভাবে শিক্ষক এবং অভিভাবকের চরিত্র হইতে বালকেরা বেশী কিছু শিখিয়া উঠিতেপারে না।

বালকের চরিত্রে তাহার সঙ্গীদিগের প্রভাবই অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। বালকের সঙ্গীদিগের মধ্যে উহার সমপাঠীরাই প্রধান। বাড়ীর এবং প্রতিবাসী অন্যান্য বালকের সহিতও মেশামেশি হয়। এই সকল সঙ্গী মিলিয়া একত্র খেলা করে, একসঙ্গে বেড়াইতে যায়, একত্র বসিয়া আমোদ প্রমোদ করে। এই বালকদিগের মধ্যে আবার যাহারা একটু অধিকবয়স্ক তাহারাই অল্পবয়স্কদিগকে পরিচালিত করে।

তারপর যৌবনের প্রারম্ভে অনেকে বিদেশে যাইয়া বিদ্যা-শিক্ষা করে। তদবস্থায় অনেক বালকের পক্ষে অভিভাবকের অধীনে থাকার সুবিধা ঘটিয়া উঠে না। অন্যান্য যুবকের সঙ্গে একত্র হইয়া নিজেরা স্বাধীন ভাবে বাস করে। এই সময়েও সহাধ্যায়ী এবং একগৃহবাসী ছাত্রগণই তাহাদের প্রধান সঙ্গী। এই সকল সঙ্গীর মধ্যে থাকিয়া অপরিণতবয়স্ক যুবকের চরিত্র গঠিত হইতে থাকে। যদি ভাগ্যক্রমে সে সৎসংসর্গে পড়ে, তবেই রক্ষা, নচেৎ অসৎসঙ্গের তীব্র আকর্ষণে কোন কোন অল্পবয়স্ক যুবকের যে কি অধোগতি ঘটিয়া থাকে তাহা সকলেরই বিদিত।

নীতিশাস্ত্রকার বলিয়াছেন "সংসর্গজা দোষা গুণা ভবন্তি"। মানুষের দোষ এবং গুণ সমস্তই সংসর্গ হইতে জন্মিয়া থাকে। সৎসঙ্গে পড়িলে মানুষ সৎ এবং সাধু হয়, আর অসৎসঙ্গে পড়িলে তদ্বিপরীত হইয়া উঠে। সংসর্গের প্রভাব বালক এবং অপরিণতবুদ্ধি যুবকের মধ্যে যত বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়, অধিকবয়স্ক লোকদিগের মধ্যে তত দেখা যায় না। এ বিষয়ে মানবহৃদয়কে চারা গাছের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। গাছ যতদিন ছোট থাকে ততদিন উহাকে যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে নোয়ান যায়, এমন কি একস্থান হইতে তুলিয়া অন্যত্র রোপণ করা যায়। সেই গাছ আবার যখন বড় হইয়া উঠে, সহস্র চেষ্টা করিয়াও উহাকে কেশমাত্র বিচলিত করা যায় না। মানবচরিত্র যতদিন অগঠিত থাকে উহাকে যে ভাবে ইচ্ছা সে ভাবে গঠিত করিয়া তোলা যায়, কিন্তু চরিত্র একবার গঠিত হইলে সহজে তাহার পরিবর্ত্তন হয় না। কোমল

মৃত্তিকাকে যে কোন ছাঁচে ফেলিয়া যেরূপ ইচ্ছা গড়িয়া লওয়া যায়, কিন্তু সেই মৃত্তিকা যখন কঠিন হইয়া উঠে তখন কিছুতেই তাহার আকৃতির পরিবর্ত্তন করা যায় না। মানবের মনও তদ্রূপ, একবার গঠিত হইলে তাহার পরিবর্ত্তন একরূপ অসম্ভব। কাযেই বাল্যকালে যাহাতে বালকগণ কুসংসর্গে মিশিতে না পারে তদ্বিষয়ে প্রখর দৃষ্টি রাখা প্রত্যেক অভিভাবকের অবশ্য কর্ত্তব্য।

আমাদের চরিত্রে যাহা দোষ এবং গুণ তাহার মূল অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে বাল্যকালের সংসর্গের মধ্যেই উহার বীজ উপ্ত হইয়াছিল। বয়সের সঙ্গে তাহার পরিণতি হইয়াছে মাত্র। যে যে সংসর্গে বাস করিয়াছে তাহার চরিত্র তদনুরূপ গঠিত হইয়াছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মানবহৃদয়ে সৎসংসর্গ অপেক্ষা অসৎসংসর্গের আকর্ষণ অধিকতর প্রবল। অসৎসঙ্গের একটা মোহিনী শক্তি আছে। অসৎসঙ্গীদের সঙ্গে মিলিয়া বালকেরা যে সকল অসৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় তাহা আপাতসুখকর। এই সুখের প্রলোভন অনেক বালক কিছুতেই এড়াইতে পারে না। ইহার পরিণাম ফল যে বিষময় অনেক বালক তাহার কিছুই জানে না। অপরিণতবয়স্ক বালকের নিকট পরিণামদৃষ্টি আশা করা যাইতে পারে না। কারণ পরিণামদৃষ্টি সাধারণতঃ অভিজ্ঞতার ফল। এ বিষয়ে কোন শিক্ষাও সে পায় নাই। কাযেই চক্ষের সম্মুখে সে যাহা দেখিতে পায় নিঃশঙ্কচিত্তে তাহাই গ্রহণ করে। অনেকস্থলে পরিণাম সম্বন্ধে সামান্য কিছু জ্ঞান থাকিলেও উপস্থিত প্রলোভনকে ত্যাগ করিতে পারে না। পরিণত বয়সে যে চিত্তসংযম মানুষকে অনেক

বিপদ হইতে রক্ষা করে সে চিত্তসংযম বালকের পক্ষে না থাকিবারই কথা। কাযেই প্রবৃত্তির তাড়না এবং অসৎ-সঙ্গীদের দৃষ্টান্ত এবং প্রলোভনে কখন কখনও সে সৎপথ পরিত্যাগ করিয়া অসৎ পথ অবলম্বন করিয়া থাকে।

অনেক সময় অসৎসঙ্গের প্রভাব অজ্ঞাতসারে হৃদয়কে আক্রমণ করিয়া থাকে। আমরা বুঝিতে পারি না কিরূপে পাপের পথে অগ্রসর হইতেছি। হয়ত মনে করি এটা সামান্য অপরাধ, অনেকেই ত এরূপ করিতেছে, আর একদিনের জন্য বইত নয়। একদিন একটু আমোদ করিয়া লই, ভবিষ্যতে আর এরূপ করিব না। কিন্তু অপরিণামদর্শী বালক বোঝে না যে একদিন একদিন করিয়াই তাহার সর্ব্বনাশের পথ উন্মুক্ত হইতেছে। পাপের পথে একবার পা ফেলিলে ফিরিয়া আসা কঠিন। ধীরে ২ সেই পথে সে অগ্রসর হইতে থাকে। মানুষের পতন একদিনে হয় না। যে সব অসৎ সঙ্গী তাহাকে প্রথম কুশিক্ষা প্রদান করিয়াছিল তাহারাই তাহাকে ক্রমাগত উৎসাহ দিতে থাকে। এইরূপে যে বালক একদিন নির্ম্মলহৃদয় এবং পূতচরিত্র ছিল যৌবনে হয়ত সে ব্যক্তিই পাপের ভীষণ প্রতিমূর্ত্তি হইয়া উঠে।

সৎসঙ্গ এবং উচ্চ আদর্শের অভাবেই অনেকের এই শোচনীয় পরিণাম ঘটিয়া থাকে। পাপের পথে যখন সে অগ্রসর হইতেছিল তখন যদি কোন বন্ধুর সৎপরামর্শ কি কোন উচ্চ আদর্শের সাক্ষাৎ পাইত, তবে হয়ত তাহার অধঃপতন ঘটিত না। যে কখনও ভাল জিনিষ দেখে নাই সে যাহা সম্মুখে পায় তাহাই

ভাল মনে করে। মানব-হৃদয় কখনও স্থির থাকিতে পারে না; একদিকে তাহার পরিণতি হইবেই হইবে। যদি উচ্চ আদর্শ সম্মুখে না পায়, তবে কাযেই উহা নিম্নগামী হইবে। ইহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নাই।

বালকদিগের চরিত্র একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই অসৎ সঙ্গের বিষময় ফল পদে পদে দৃষ্টিগোচর হইবে। ইহার শত শত দৃষ্টান্ত আমাদের চক্ষের উপর বর্ত্তমান; হয় ত অনেকে উহার প্রভাব নিজ জীবনেই অনুভব করিয়াছেন। এই যে চুরুট সেবনের প্রথা আমাদের বালকদিগের মধ্যে অত্যন্ত প্রসার লাভ করিয়াছে অসৎসঙ্গই কি তাহার প্রধান কারণ নহে? ধূমপানের কি আমোদ অনভিজ্ঞ বালক প্রথমে তাহার কিছুই জানিতে পারে না। হয়ত তাহার একজন সঙ্গী ধূমপানের সুখ তাহাকে বুঝাইয়া দিয়া একটী চুরুট তাহার হাতে তুলিয়া দিল; বালকটী মনে করিল তাহার সঙ্গীরা সকলেই যখন চুরুট সেবন করে তবে তাহার আর দোষ কি? সে নিঃশঙ্কচিত্তে চুরুটটী সেবন করিল। এইরূপে ২।৪ দিন খাইতে খাইতেই চুরুট সেবনে তাহার আসক্তি জন্মিয়া গেল এবং কালে হয়ত সে ভয়ঙ্কর চুরুটসেবী হইয়া উঠিল। ভদ্রঘরের যুবকদিগের মধ্যে যে অনেক মদ্যপায়ী চোর প্রভৃতি দেখা যায় তাহাদের পূর্ব্ব ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে উহারা সর্ব্বপ্রথমে কুসঙ্গীদিগের নিকটেই ঐ সকল দুষ্ক্রিয়া অভ্যাস করিয়াছে।

পক্ষান্তরে সৎসঙ্গের অশেষ গুণ। অসৎসঙ্গে যেরূপ চরিত্রের অবনতি হয় সৎসঙ্গে তেমনি চরিত্রের উন্নতি লক্ষিত হইয়া

থাকে। যাহাদের সঙ্গে সর্ব্বদা বাস করি তাহারা সকলেই যদি সচ্চরিত্র হয়, সদালাপ এবং সৎচিন্তাতেই যদি তাহাদের সময় সর্ব্বদা অতিবাহিত হয় তবে বাধ্য হইয়াই আমাকেও সৎভাবে জীবন যাপন করিতে হইবে। চারিদিকে সাধু জীবনের মধ্যে আমার যদি কখনও অসাধু পথ অবলম্বন করিবার প্রবৃত্তি হয় সকলের ঘৃণা এবং ধিক্কার আসিয়া নিশ্চয়ই আমাকে পাপ পথ হইতে নিরস্ত করিবে। অনেক সময় তাহাদের সস্নেহ সদুপদেশ আমাকে কুপ্রবৃত্তি এবং দুষ্ক্রিয়া হইতে রক্ষা করিবে।

অসৎসঙ্গের ন্যায় সৎসঙ্গ অলক্ষিতে মানবহৃদয়ে আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে। অনেক সময় দেখিতে পাওয়া যায় যে অসচ্চরিত্র বালক সৎসঙ্গে পড়িয়া আপনা হইতেই নিজের চরিত্র সংশোধন করিয়া থাকে। তজ্জন্য তাহাকে বিশেষ কোনও চেষ্টা করিতে হয় না। সচ্চরিত্রের আকর্ষণে নিজের চরিত্র অজ্ঞাতসারে আপনা হইতেই উন্নত হইতে থাকে। মানুষের স্বাভাবিক অনুকরণ প্রবৃত্তিই এ প্রকার উন্নতির মূল কারণ।

ভাগ্যক্রমে যাহারা সাধুমহাত্মাদের সঙ্গ লাভ করিতে পারেন তাহাদেরত কথাই নাই। ধর্ম্মজীবনে এই সাধুসঙ্গের প্রভাব হয়ত অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। নৈতিক জগতেও এই সাধুসঙ্গের অপরিসীম প্রভাব লক্ষিত হয়। নৈতিক জীবনের উন্নতি-সাধনে অনেক সময় নিজের আন্তরিক চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়া যায়, কিন্তু সাধুদের পুণ্যপ্রভাব কখনও নিষ্ফল হয় না। হয় ত একটা কুপ্রবৃত্তি হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছে। শতচেষ্টা করিয়াও কিছুতেই

হৃদয় হইতে উহা দূর করিতে পারিতেছি না। এ অবস্থায় কোনও সাধুমহাত্মার নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহার আধ্যাত্মিক প্রভাবে আমাদের পাপপ্রবৃত্তি আপনাহইতেই চলিয়া যায়। জড় জগতে বৃহৎ বস্তু ক্ষুদ্রবস্তুকে আপনার নিকট টানিয়া লয়, আধ্যাত্মিক জগতেও উন্নত আত্মা অনুন্নত আত্মাগুলিকে আপনার পুণ্যপ্রতিভায় মণ্ডিত করিয়া দেয়। ধর্ম্মশাস্ত্রে এই সাধুসঙ্গের অশেষ গুণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। অনেক ঘোর পাপী সাধু মহাত্মার সংসর্গে আসিয়া উদ্ধার লাভ করিয়াছে। যদি মহাপাপীরও উদ্ধারসাধন সম্ভবপর হয় তবে কাহারও নিরাশ হওয়ার কারণ নাই। প্রকৃত মহাত্মার সংসর্গে আসিলে আত্মার কিছু না কিছু উন্নতিসাধন অবশ্যম্ভাবী।

মানবচরিত্রের উপর যখন সংসর্গের এত প্রভাব তখন অল্পবয়স্ক বালকবালিকাদিগকে বাল্যকাল হইতেই অসৎ সংসর্গ হইতে দূরে রাখিতে প্রত্যেক অভিভাবকেরই বিশেষ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এবিষয়ে অভিভাবকদিগেরই সম্পূর্ণ দায়িত্ব। এ দায়িত্ব যেন কেহ বিস্মৃত না হন। অল্পবয়স্ক বালকেরা অনেক স্থলেই নিজেদের হিতাহিত বুঝিতে পারে না। অসৎ সংসর্গে পড়িলে চরিত্রের যে অবনতি হইবে এবং তজ্জন্য চিরজীবন যে দুঃখভোগ করিতে হইবে এই জ্ঞান অতি অল্প বয়সে জন্মে না। সাধারণতঃ বালকেরা সাময়িক ভাবদ্বারাই চালিত হইয়া থাকে। চিত্তসংযম অভিজ্ঞতা এবং অধ্যবসায় সাপেক্ষ। এজন্য অভিভাবকদিগের বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে যেন তাহাদের অধীনস্থ বালকগণ অসৎসংসর্গে মিশিতে না পারে। যতদিন বালক-

দিগের হিতাহিত জ্ঞান না জন্মে এবং যতদিন তাহারা নিজের ভালমন্দ বুঝিয়া লইতে না পারে ততদিনই এই সাবধানতার দরকার হইবে। সৎসঙ্গে মিশিয়া চরিত্র একবার গঠিত হইলে বালকেরা অসৎসঙ্গ অপ্রীতিকর বলিয়া আপনাহইতেই ত্যাগ করিবে। তখন আর তাহাদিগকে প্রলোভনের বিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্য অভিভাবকের সস্নেহ সতর্ক দৃষ্টির প্রয়োজন হইবে না।

মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত।

পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই সকল বিভিন্ন প্রদেশের রাজাদিগের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ-বিগ্রহাদি ঘটিত এবং যখন কোন নৃপতি পার্শ্ববর্ত্তী রাজন্যবর্গকে পরাভূত করিয়া চতুর্দ্দিকে আপনার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইতেন তখনই তাঁহাকে রাজচক্রবর্ত্তী আখ্যা দেওয়া হইত। কখন কখনও এই প্রকার রাজচক্রবর্ত্তী অশ্বমেধ বা রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠানদ্বারা আপনার পরাক্রম দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইতেন। পৌরাণিক যুগের যুধিষ্ঠিরাদি নৃপতির কথা ছাড়িয়া দিলে ঐতিহাসিক যুগে যাঁহারা রাজচক্রবর্ত্তীপদ লাভ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে চন্দ্রগুপ্তই সর্ব্ব-প্রথম। তিনি যে কেবল নামতঃ সম্রাট্ পদ লাভ করিয়াছিলেন তাহা নহে, তিনিই সর্ব্বপ্রথম একটি বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

এবং সর্ব্বত্র শৃঙ্খলা স্থাপনপূর্ব্বক বহুকাল শাসন করিয়া উপযুক্ত পুত্রের হস্তে উহা সমর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য যে কেবল ভারতবর্ষের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল তাহা নহে; কাবুল, হিরাট, কান্দাহার প্রভৃতি দেশও তখন চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যে ব্যক্তি অল্পবয়সে স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া স্বীয় রণকৌশল এবং বুদ্ধিবলে একটি রাজ-বংশের উচ্ছেদ এবং পরাক্রান্ত বিদেশী শত্রুর পরাভব সাধন পূর্ব্বক একটী বহু বিস্তৃত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন তিনি যে জগতের পরাক্রান্ত বীরপুরুষদিগের মধ্যে উচ্চ আসন পাওয়ার যোগ্য তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

চন্দ্রগুপ্ত ঠিক্ কোন্ সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন বহু গবেষণার পর তাহা একপ্রকার স্থির হইয়াছে। প্রসিদ্ধ দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেন সেই সময় চন্দ্রগুপ্ত স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া তাঁহার শিবিরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। কাজেই খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীই চন্দ্রগুপ্তের আবির্ভাব কাল তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। চন্দ্রগুপ্তের বাল্যজীবনের বিশেষ কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না। তিনি তাৎকালীন মগধের রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মাতা মুরা নীচজাতীয়া ছিলেন বলিয়া চন্দ্রগুপ্ত জাত্যংশে নিতান্ত হীন বলিয়া বিবেচিত হইতেন। মুরার গর্ভজাত বলিয়া চন্দ্রগুপ্তের বংশগত নাম ছিল মৌর্য্য এবং এই জন্যই চন্দ্রগুপ্তের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ মৌর্য্যবংশ নামে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

কোনও অজ্ঞাত কারণ বশতঃ অল্পবয়সেই চন্দ্রগুপ্ত তাৎকালীন মগধের রাজা মহাপদ্ম নন্দের বিরাগভাজন হন এবং রাজকোপে পড়িয়া তাঁহাকে স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইতে হয়। এই নির্ব্বাসিত অবস্থাতেই মহাবীর আলেকজাণ্ডারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। মগধরাজ্য আক্রমণের জন্য আলেকজাণ্ডারকে তিনি উৎসাহিত করিয়াছিলেন, কিন্তু সৈন্যগণ আর অধিকদূর অগ্রসর হইতে অস্বীকৃত হওয়ায় বাধ্য হইয়া মগধজয়ের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক আলেকজাণ্ডারকে স্বদেশাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। ইহার অল্পকাল পরেই বাবিলন নগরে মহাবীর আলেকজাণ্ডার মানবলীলা সম্বরণ করেন।

চন্দ্রগুপ্ত এতদিন ভারতের উত্তরপশ্চিম প্রদেশকে গ্রীক অধীনতা হইতে মুক্ত করিবার অবসর খুজিতেছিলেন। আলেকজাণ্ডারের আকস্মিক মৃত্যুতে সেই সুযোগ উপস্থিত হইল। চন্দ্রগুপ্ত সীমান্ত পার্ব্বত্য প্রদেশে বল সঞ্চয় করিয়া প্রবলপরাক্রমে পঞ্জাবস্থ গ্রীক সৈন্যনিবাসসমূহ আক্রমণ করিলেন। গ্রীকগণ এ আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া পঞ্জাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক পশ্চিমাভিমুখে প্রস্থান করিল।

পঞ্জাবে আপন আধিপত্য দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিয়া চন্দ্রগুপ্ত তাহার চিরশত্রু মগধরাজ মহাপদ্ম নন্দকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে চাণক্য নামক জনৈক কূটবুদ্ধি ব্রাহ্মণ কোনও কারণে মগধরাজের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া নন্দবংশধ্বংশের সুযোগ খুজিতেছিলেন। চাণক্যের অপর নাম কৌটিল্য। চাণক্য এবং চন্দ্রগুপ্ত উভয়েরই উদ্দেশ্য এক—

নন্দবংশের বিলোপসাধন। কাজেই উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল এবং চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যকে আপন মন্ত্রীপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহারই পরামর্শে মগধ আক্রমণের আয়োজন করিতে লাগিলেন। পরস্পরের সহায়তায় উভয়েরই বলবৃদ্ধি হইল এবং এই সম্মিলিত শক্তির নিকট মগধরাজমুকুট লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। মহাপদ্ম যে কেবল পরাজিত হইলেন তাহা নহে নন্দবংশ একবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল।

খ্রীঃ পূঃ ৩২২ অব্দে চন্দ্রগুপ্ত মগধ রাজ্য জয় করেন এবং মগধের সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া চতুর্দ্দিকে রাজ্যবিস্তার করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে ক্রমে উত্তর ভারতের সমস্ত প্রদেশই চন্দ্রগুপ্তের অধীনতা স্বীকার করিল এবং বঙ্গোপসাগর হইতে আরব সাগর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র তিনি একচ্ছত্র সম্রাট্-রূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন। বিন্ধ্যপর্ব্বতের দক্ষিণে তিনি কোনও প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন কিনা তাহা নিশ্চিত জানা যায় না। তবে উজ্জয়িনী ও গুজরাট যে তাহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্ব্বত, পশ্চিমে আরব সমুদ্র এবং উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত—এই চতুঃসীমাবেষ্টিত বিস্তীর্ণ ভূভাগের উপর মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত আপন আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

যে সময়ে চন্দ্রগুপ্ত ভারতে আপনার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিতেছিলেন ঠিক সেই সময়ে আলেকজাণ্ডারের একজন সেনাপতি পশ্চিম ও মধ্য এসিয়ায় একটি সাম্রাজ্য স্থাপনপূর্ব্বক পঞ্জাব প্রদেশে পুনরায় গ্রীকপতাকা উড্ডীন করিবার সুযোগ

খুঁজিতেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে খৃঃ পূঃ ৩০৫ অব্দে সেলুকাস নিকাটর সিন্ধুনদী অতিক্রম করিয়া বিপুলবিক্রমে পঞ্জাব আক্রমণ করিলেন। চন্দ্রগুপ্তও নিশ্চেষ্ট ছিলেন না, তিনি বিভিন্ন প্রদেশ-হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। চন্দ্রগুপ্তের সহিত সেলুকাসের কোন যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল কি না তাহা নিশ্চিত জানা যায় না। কিন্তু একথা সত্য যে চন্দ্রগুপ্তের বিপুলবাহিনী দর্শনে ভীত হইয়া সেলুকাস অবিলম্বে তাঁহার সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে বাধ্য হইলেন। খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩০৩ অব্দে এই বিখ্যাত সন্ধিপত্র সম্পাদিত হইয়াছিল। এই সন্ধির সর্ত্তানুসারে সেলুকাসকে ভারতবিজয়ের দুরাশা ত্যাগ করিতে হইল; কেবল তাহাই নহে বর্ত্তমান কাবুল, কান্দাহার, হিরাট এবং মাক্‌রাণ প্রদেশ চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া গেল। সেলুকাস আপনার এক কন্যাকে চন্দ্রগুপ্তের হস্তে প্রদান করিলেন এবং প্রতিদানে চন্দ্রগুপ্ত হইতে ৫০০ হস্তী গ্রহণপূর্ব্বক গ্রীক বীর ভারত হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

এই সময়ই ভারতের প্রকৃত গৌরবের কাল। ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষের একজন স্বাধীন নৃপতি অগণিত গ্রীকসৈন্যকে পরাজিত করিয়া বঙ্গোপসাগর হইতে হিন্দুকুশ পর্য্যন্ত একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন একথা স্মরণ করিলেও গর্ব্ব-ভরে আমাদের হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠে। চন্দ্রগুপ্তের প্রতিভার বিষয় চিন্তা করিলে আমরা আরও বিস্মিত হই। যে যুবক একদিন স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া সাহায্যলাভের আশায় দীনবেশে মহাবীর আলেকজাণ্ডারের শিবিরে উপনীত হইয়া-

ছিলেন তিনিই পরে আলেকজাণ্ডারের সেনাপতিগণকে পরাভূত করিয়া পঞ্জাব প্রদেশ উদ্ধার করিয়াছিলেন এবং তাহারি কিছু-কাল পরে মহাবীর সেলুকাসকে পরাজিত করিয়া আফগানিস্তান ও তুর্কিস্তানের অধিকাংশ আপন সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন।

সেলুকাসের সহিত সন্ধিস্থাপনের পর মেগাস্থিনিস নামক জনৈক গ্রীক দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া চন্দ্রগুপ্তের সভায় আগমন করেন। এই মেগাস্থিনিস সূক্ষ্মদর্শী, সত্যবাদী পণ্ডিত বলিয়া সর্ব্বত্র পরিচিত। তিনি প্রায় ৬ বৎসর কাল মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রে অবস্থান করিয়া রাজধানী এবং রাজকার্য্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করিয়াছিলেন এবং এসম্বন্ধে তিনি যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে ভারতবর্ষের তাৎকালীন অবস্থার অনেক কথা অবগত হওয়া যায়। মেগাস্থি-নিস ভারতবর্ষ সম্বন্ধে স্বয়ং যে গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছিলেন তাহা বর্ত্তমান নাই, কিন্তু পরবর্ত্তী গ্রীক ঐতিহাসিকগণ মেগাস্থিনিসের গ্রন্থ হইতে যে সকল স্থল উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন তাহাই এক্ষণে আমাদের সম্বল। মেগাস্থিনিস চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী, রাজ্য-শাসন, বিচারপদ্ধতি, তাৎকালীন সামাজিক অবস্থা প্রভৃতি নানা বিষয়েরই বর্ণনা করিয়াছিলেন। আমরা নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিলাম।

খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে লিচ্ছবিদিগের দমনার্থ গঙ্গা ও শোণনদীর সঙ্গমস্থলে মগধরাজ অজাতশত্রুকর্ত্তৃক একটী দুর্গ নির্ম্মিত হয়। তাহার পৌত্র উদয় দুর্গপ্রাকারের চারিদিকে একটী নগরের প্রতিষ্ঠা করেন। ঐ নগরই ভবিষ্যতে পাটলিপুত্র

নামে খ্যাতিলাভ করে। পাটলিপুত্রের অপর নাম কুসুমপুর বা পুষ্পপুর। চন্দ্রগুপ্তের সময়ে পাটলিপুত্রের বহুবিধ উন্নতি সাধিত হয়। বর্ত্তমান পাট্‌না এবং বাঁকীপুরই প্রাচীন পাটলিপুত্রের স্থান। চন্দ্রগুপ্তের সময় পাটলিপুত্রের দৈর্ঘ্য ৯ মাইল এবং প্রস্থ ১॥ মাইল ছিল। নগরের চতুর্দ্দিকে কাষ্ঠনির্ম্মিত প্রাচীর এবং নগরপ্রবেশের জন্য প্রাচীরের গাত্রে ৬৪টী তোরণদ্বার ছিল এবং তদুপরি ৫৭০ চূড়া বর্ত্তমান থাকিয়া রাজপ্রাসাদের গৌরব ঘোষণা করিত। প্রাচীরের চতুর্দ্দিকে প্রশস্ত পরিখা সর্ব্বদা শোণ নদীর জলে পরিপূর্ণ থাকিত।

রাজপ্রাসাদ যদিও কাষ্ঠনির্ম্মিত তথাপি দৃশ্যহিসাবে অতুলনীয় ছিল। একটী বৃহৎ সরোবর-শোভিত উদ্যানের মধ্যে মনোরম হর্ম্ম্যাবলি নানা চিত্রে চিত্রিত হইয়া শোভা পাইত।

রাজসভার জাকজমকেরও তুলনা ছিল না। স্বর্ণ ও রৌপ্যের বাসন, স্বর্ণ ও রৌপ্য খচিত আসনসমূহ, নানা রত্নখচিত ভোজ্যপাত্রদ্বারা রাজগৃহের সমৃদ্ধি সূচিত হইত। সম্রাটের বাহিরে যাওয়ার জন্য রত্নখচিত পাল্কী ব্যবহৃত হইত। দূর স্থানে যাতায়াতের জন্য রাজা সুবর্ণবস্ত্রবিমণ্ডিত হস্তীতে আরোহণ করিতেন। অল্প দূরের জন্য অশ্বযান প্রচলিত ছিল।

মৃগয়া যাত্রা তখনকার রাজসভার প্রধান আমোদ ছিল। সশস্ত্র স্ত্রীগণ পরিবেষ্টিত হইয়া রাজা মঞ্চোপরি অবস্থিত থাকিতেন এবং চতুর্দ্দিক হইতে জন্তুসমূহকে তাড়াইয়া তাহার মঞ্চসমীপে আনয়ন করা হইত। খোলা যায়গায় শীকারে যাইতে হইলে হস্তীতে আরোহণ করিতেন। রাজা যে পথে

গমন করিতেন তাহার দুই পার্শ্ব রজ্জুদ্বারা চিহ্নিত করা হইত। যদি কেহ ঐ রজ্জু অতিক্রম করিয়া রাজার জন্য নির্দ্দিষ্ট পথে আসিয়া উপস্থিত হইত অমনি তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হইত। রাজা অনেক সময়, অন্তঃপুরেই বাস করিতেন। প্রজাবর্গের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সময়, বিচার কার্য্য সম্পাদনের জন্য, অথবা যুদ্ধযাত্রা বা মৃগয়াকালে প্রকাশ্যে বাহির হইতেন। প্রতি বৎসর রাজার জন্ম দিনে উৎসব হইত এবং সেই উৎসবে সমস্ত প্রজা ও অমাত্যবর্গ রাজগৃহে নানাবিধ উপঢৌকন প্রেরণ করিতেন।

রাজকার্য্য প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত ছিল। সৈন্যবিভাগ এবং সাধারণবিভাগ। সৈন্যবিভাগের উৎকর্ষসাধনের জন্য চন্দ্রগুপ্ত যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করিতেন; তাঁহার সৈন্যসংখ্যাও প্রচুর ছিল। ৬০০০০ পদাতিক, ৩০০০০ অশ্বারোহী, ৯০০০ হস্তী এবং ৮০০০ রথ সর্ব্বদা যুদ্ধের জন্য সসজ্জ থাকিত। এই বিপুল বাহিনীর অধীশ্বর যে সমস্ত আর্য্যাবর্ত্তে আপনার প্রভুত্ব স্থাপন করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি!

সৈন্যবিভাগের শৃঙ্খলা স্থাপনের জন্য ছয়টী সমিতি গঠিত হইয়াছিল। প্রত্যেক সমিতির প্রতি বিশেষ বিশেষ কার্য্যের ভার ছিল। কোন সমিতি নৌবাহিনীর তত্ত্বাবধান করিত, কোন সমিতির প্রতি রসদ সরবরাহের ভার ছিল। হস্তী, অশ্ব, রথ, এবং পদাতি—ইহাদের প্রত্যেকের জন্যও একটী করিয়া সমিতি নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই সকল বিভিন্ন সমিতির কার্য্য অতি সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হইত।

সাধারণ বিভাগের কার্য্যও এইরূপ বিভিন্ন সমিতির উপর ন্যস্ত ছিল। প্রথম সমিতি সর্ব্বপ্রকার শ্রমশিল্পের তত্ত্বাবধান করিত। বেতনের হার নির্দ্দিষ্ট করা, খাটি জিনিষপত্রের সরবরাহ করা, এবং বেতনের উপযোগী কার্য্য সম্পন্ন হইল কি না তাহার পরীক্ষা করা প্রভৃতি এই সমিতির কার্য্য। শ্রমশিল্পি-গণ প্রধানতঃ রাজার কার্য্যেই নিয়োজিত থাকিত এবং কেহ কোন শিল্পীর হস্ত কি চক্ষু নষ্ট করিয়া তাহাকে অকর্ম্মণ্য করিলে তাহার প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ ছিল।

দ্বিতীয় সমিতি বৈদেশিকদিগের তত্ত্বাবধান করিত। তাহাদের বাসস্থান নিরূপণ, তাহাদের দেহরক্ষার জন্য রক্ষিনিয়োগ, আবশ্যক মত চিকিৎসকের বন্দোবস্ত করা এই বিভাগের প্রধান কার্য্য ছিল। রাজভৃত্যগণ সর্ব্বদা বিদেশীদিগের অনুগমন করিত। কোন বৈদেশিকের মৃত্যু হইলে তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার সুবন্দোবস্ত করা হইত এবং তাহার ত্যক্ত সম্পত্তি তদীয় আত্মীয়গণকে প্রদান করা হইত। বাস্তবিক চন্দ্রগুপ্তের সময় বিদেশী অতিথির প্রতি যেরূপ যত্ন এবং সম্মান প্রদর্শন করা হইত বর্ত্তমান সভ্যতাদৃপ্ত বিংশ শতাব্দীতেও তদ্রূপ কোন আয়োজনই দৃষ্ট হয় না।

তৃতীয় সমিতি কর্ত্তৃক জন্ম মৃত্যুর তালিকা প্রস্তুত হইত। তালিকা হইতে রাজকর্ম্মচারীগণ দেশের লোকসংখ্যার বিষয় অবগত হইত এবং এই তালিকা দৃষ্টে প্রত্যেকের দেয় রাজকর নির্দ্দিষ্ট হইত। এই আদমসুমারি বাস্তবিকই আশ্চর্য্যের বিষয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও এই লোকগণনা ততটা প্রচলিত

ছিল না, অথচ ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে একজন হিন্দু রাজা আপনার রাজ্যে এই প্রথার প্রচলন করিয়াছিলেন।

চতুর্থ সমিতির উপর বাণিজ্য পরিদর্শনের ভার ছিল। ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থাসাধন, জিনিষপত্রের ওজনের জন্য প্রকৃত বাটখারা ব্যবহৃত হয় কি না তাহার তত্ত্বাবধান এই সমিতি-কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইত। বাণিজ্যব্যবসায়ীদিগকে একপ্রকার রাজকর দিতে হইত, এবং একাধিক জিনিষের ক্রয় বিক্রয় করিলে দ্বিগুণ কর আদায়ের ব্যবস্থা ছিল।

পঞ্চম সমিতি কর্ত্তৃক শিল্পদ্রব্যের তত্ত্বাবধান হইত। নূতন এবং পুরাতন জিনিষ বিভিন্ন করিয়া রাখিতে হইত। উভয় জিনিষ একত্র মিশাইয়া ফেলিলে তজ্জন্য শাস্তির ব্যবস্থা ছিল। বিক্রীত দ্রব্যের মূল্যের দশমাংশ রাজকরস্বরূপ প্রদান করিতে হইত। এই কর আদায়ের ভার ষষ্ঠ সমিতির উপর অর্পিত ছিল। প্রতারণাপূর্ব্বক এই কর প্রদান না করিলে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল।

উপরিলিখিত ব্যবস্থাসমূহ রাজধানী পাটলীপুত্রসম্বন্ধেই প্রযোজ্য ছিল। কিন্তু এই সকল নিয়ম তক্ষশিলা, গান্ধার প্রভৃতি প্রদেশেও প্রচলিত ছিল এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। এই সমস্ত বিশেষ কার্য্য ব্যতীত বিভিন্ন সমিতির সভ্যগণ একযোগে রাজধানীর সমুদায় কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। বাজার, মন্দির, বন্দর প্রভৃতির শৃঙ্খলাবিধানও সমিতির সভ্যগণের উপর ন্যস্ত ছিল।

চন্দ্রগুপ্তের বৃহৎ সাম্রাজ্য ৩টী প্রধান প্রদেশে বিভক্ত ছিল—

মগধ, গান্ধার ও অবন্তী। বর্ত্তমান পঞ্জাব, কাশ্মীর এবং উত্তর-পশ্চিমের সীমান্ত প্রদেশসমূহ গান্ধারের অন্তর্ভুক্ত ছিল। গান্ধারের রাজধানী ছিল তক্ষশীলা। বর্ত্তমান রাওলপিণ্ডির নিকট তক্ষশিলার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। অবন্তীর রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী। এই উজ্জয়িনী হইতে পশ্চিম ভারত শাসিত হইত। সম্রাট পাটলীপুত্রে থাকিয়া মগধ, বৈশালী, কোশল প্রভৃতি প্রদেশ শাসন করিতেন। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিন্দুসার কর্ত্তৃক দাক্ষিণাত্য এবং পৌত্র অশোককর্ত্তৃক কলিঙ্গ বিজিত হইলে আরও দুইটী প্রাদেশিক রাজধানীর প্রতিষ্ঠা হয়—দাক্ষিণাত্যের রাজধানী সুবর্ণগিরি এবং কলিঙ্গের রাজধানী তোষালী।

দূরবর্ত্তী প্রদেশসমূহের শাসনকার্য্য প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারাই নির্ব্বাহ করিতেন। সাধারণতঃ রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিগণই এই সকল শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত হইতেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের সমকালীন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণের বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায় না।

দূরদেশ হইতে রাজার নিকট সংবাদ পৌঁছাইবার জন্য এক শ্রেণীর লোক নিযুক্ত ছিল। ইহারা বিভিন্ন নামে অভিহিত হইত। সহরে অথবা গ্রামে যে সকল ঘটনা ঘটিত তাহা পরিদর্শন করিয়া গোপনে রাজার নিকট সংবাদ পৌঁছানই ইহাদের প্রধান কার্য্য ছিল। এই সকল সংবাদ প্রায়ই সত্য হইত, কারণ সেই সময়কার ভারতবর্ষীয়গণ সাধুতা এবং সত্য-বাদিতার জন্য সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ছিল।

চন্দ্রগুপ্তের দণ্ডবিধি বড়ই কঠোর ছিল। কিন্তু তখনকার কালে শাস্তিযোগ্য অপরাধের সংখ্যা নিতান্ত অল্প ছিল বলিয়া দণ্ডবিধি প্রায়ই প্রয়োগ করিতে হইত না। চৌর্য্য প্রভৃতি অপরাধ একরূপ ছিল না বলিলেই চলে। কিন্তু কোন অপরাধ করিলে অপরাধীকে নিতান্ত লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইত। কেহ কাহারও অঙ্গচ্ছেদ করিলে অপরাধীরও উক্ত অঙ্গ ছিন্ন করা হইত। মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করিলে হস্তপদাদি কর্ত্তন করা হইত। কোন ধর্ম্মকার্য্যে নিযুক্ত বৃক্ষের অনিষ্ট সাধন করিলে, রাজার মৃগয়া কালে বিনানুমতিতে রাজনির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রবেশ করিলে প্রাণদণ্ড হইত।

ভূমির রাজস্ব হইতে তৎকালে যথেষ্ট আয় হইত এবং দেশের সমস্ত ভূমিই রাজার সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হইত। উৎপন্ন শস্যের এক চতুর্থাংশ রাজকরস্বরূপ প্রদান করিতে হইত। কিন্তু কতকাল পরে ভূমির বন্দোবস্ত হইত তাহা জানা যায় না।

কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য রাজা বিশেষ চেষ্টা করিতেন। কৃষিকার্য্যের জন্য জলসেচনাদির পর্য্যবেক্ষণ নিমিত্ত একটী স্বতন্ত্র বিভাগ ছিল। এই বিভাগস্থ কর্ম্মচারীগণ ভূমির পরিমাণ করিয়া কাহার কতটুকু জল আবশ্যক তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিত। চন্দ্রগুপ্তের সময় দূরস্থ প্রদেশেও জল সরবরাহের জন্য নদী, নালা প্রভৃতি জলাশয়ের ব্যবস্থা ছিল। ২৫০ খৃষ্টাব্দে খোদিত রাজা রুদ্রদমনের অনুশাসন হইতে জানা যায় গির্ণার পর্ব্বতের সন্নিহিত প্রদেশে কৃষিকার্য্যের সুবিধার জন্য চন্দ্রগুপ্তের প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তা পুষ্যগুপ্তচারিদিকে বাঁধ দিয়া সুদর্শন নামে একটা বৃহৎ

জলাশয় প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কিন্তু উক্ত জলাশয়ে জলসঞ্চয়ের জন্য প্রয়োজনীয় খাল নালা প্রভৃতি তখনও খনিত হইয়াছিল না। মহারাজ অশোকের রাজত্ব কালে তাঁহার প্রতিনিধিকর্ত্তৃক ঐ সকল খাল ও নালা কর্ত্তিত হইয়া জলাশয়টী ব্যবহারোপযোগী অবস্থায় পরিণত হয়। সেই সময় হইতে ১৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৪৫০ বৎসর কাল ঐ সুদর্শন হ্রদ বিদ্যমান থাকিয়া কৃষকদের কৃষিকার্য্যের জল সরবরাহ করিয়াছিল। উক্ত বৎসর প্রবল বাত্যা ও বন্যায় চারিদিকের বাঁধগুলি ভূপতিত হওয়ায় রুদ্রদমন কর্ত্তৃক উহাদের পুনঃসংস্কার হইয়াছিল। মৌর্য্যবংশীয় সম্রাট্‌গণ যে দূরবর্ত্তী প্রদেশস্থ প্রজাগণের হিতের জন্য কত চিন্তা করিতেন রুদ্রদমনের এই প্রস্তরলিপিই তাহার জাজ্বল্যমান প্রমাণ।

রাজা স্থানীয় কর্ম্মচারীর সাহায্যে বিভিন্ন জাতির কার্য্যকলাপ পরিদর্শন করিতেন। ব্রাহ্মণ, জ্যোতির্ব্বিৎ, গণক, পুরোহিত কেহই রাজানুগ্রহে বঞ্চিত ছিল না। গণনা সত্য হইলে গণকেরা পুরস্কৃত হইতেন, আবার মিথ্যা প্রতিপন্ন হইলে শাস্তিলাভ ঘটিত। অর্ণবযাননির্ম্মাতা এবং শস্ত্রনির্ম্মাতাগণ রাজসরকার হইতে বেতন পাইত, কাঠুরিয়া, সূত্রধর, লৌহমিস্ত্রী এবং আকরিকগণের প্রতিও রাজার বিশেষ দৃষ্টি ছিল।

রাজপথসমূহের পরিদর্শন জন্য ভিন্ন কর্ম্মচারী নিযুক্ত ছিল। দূরত্ব প্রদর্শনের জন্য প্রত্যেক অর্দ্ধ ক্রোশ অন্তর প্রস্তরখণ্ড প্রোথিত ছিল। রাজধানী পাটলীপুত্র হইতে উত্তরপশ্চিম সীমান্ত পর্য্যন্ত একটী প্রশস্ত রাজপথ বিস্তৃত ছিল।

আমরা উপরে চন্দ্রগুপ্তের শাসনপ্রণালীর যে বিবরণ প্রদান

করিলাম তাহা হইতেই বুঝা যাইবে ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে সভ্যতার কিরূপ বিকাশ হইয়াছিল। বিংশ শতাব্দীতে যেরূপ রাজকার্য্য বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে, তখনও তদ্রূপ ছিল ; আজকাল যে স্বায়ত্ত শাসনের আমরা বড়াই করিয়া থাকি, যাহার জন্য এত আন্দোলন, হৈ চৈ হইতেছে সে স্বায়ত্ত শাসন তখনকার সময়েও প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক গ্রামের কার্য্য গ্রামের পঞ্চাইতগণই সম্পাদন করিতেন। তবে সে সময়ে এখনকার মত মারামারি কাটাকাটি হইত না। সমস্তই সুশৃঙ্খলভাবে নির্ব্বিবাদে সম্পন্ন হইত। তাহারও কারণ ছিল। তখনকার লোকে এত মিথ্যাকথা বলিত না, তাহাদের এত আত্মম্ভরিতাও ছিল না। মোটের উপর তখনকার সভ্যতা এখনকার অপেক্ষা অনেক বিষয়ে সমুন্নত ছিল।

২৪ বৎসর রাজত্বের পর খৃঃ পূঃ ২৯৭ অব্দে চন্দ্রগুপ্ত মানবলীলা সম্বরণ করেন। এই ২৪ বৎসরের মধ্যে তিনি যে সব কার্য্য সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন তাহা বিবেচনা করিলে তাহাকে একজন অদ্ভুতকর্ম্মা লোক বলিয়াই মনে হয়। চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র বিন্দুসারের সহিত তাৎকালীন গ্রীক নৃপতি এণ্টিওকাস সটারের মিত্রতা ছিল এবং বিন্দুসারের রাজসভায় ডিমেকস নামে একজন গ্রীক দূতও প্রেরিত হইয়াছিল। মেগাস্থিনিসের ন্যায় ডিমেকসও ভারত সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার লিখিত গ্রন্থ বর্ত্তমান নাই। মিশর দেশ হইতেও একজন দূত আসিয়াছিলেন। তাহার নাম ডাইওনিসিয়াস। তাঁহার লিখিত বিবরণও এখন লুপ্ত।

অনেকে অনুমান করেন যে বিন্দুসারের সময়েই দাক্ষিণাত্যের কিয়দংশ মগধসাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। যদি এ অনুমান সত্য হয় তবে বুঝিতে হইবে যে বিন্দুসার পিতার ন্যায় সমর-নিপুণ দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন। যাহা হউক তিনি যে শাসনকুশল ছিলেন তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ২৫ বৎসর রাজত্বের পর খৃঃ পূঃ ২৭২ অব্দে মহারাজ বিন্দুসার দেহত্যাগ করেন। বিন্দুসারের পর তদীয় পুত্র ইতিহাসপ্রসিদ্ধ অশোক বা প্রিয়দর্শী মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

মেঘ, বৃষ্টি ও বরফ।

মেঘ বৃষ্টির কথা বলিতে গেলে সর্ব্বপ্রথমেই বায়ুমণ্ডলের কথা আমাদিগের মনে পড়ে। আমরা বায়ুরাশির মধ্যে ডুবিয়া আছি, বায়ু না হইলে আমরা এক দণ্ডও বাঁচিয়া থাকিতে পারি না। অথচ এই বায়ু চক্ষে দেখা যায় না, হাত দিয়াও ধরা যায় না। কেবল সময়ে সময়ে গায়ে লাগে বলিয়া আমরা উহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া থাকি। এই বায়ুমণ্ডল পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে, এবং পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে ৫০ মাইল ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত বায়ুরাশির অস্তিত্ব অনুমিত হয়। এই বায়ুমণ্ডলের ঊর্দ্ধে কেবল শূন্য আকাশ এবং এই মহাশূন্যে গ্রহ উপগ্রহগণ অবিরাম গতিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

আমরা যে বায়ু প্রতি নিঃশ্বাসে গ্রহণ করিতেছি তাহা কতক-

গুলি পদার্থের সংযোগে গঠিত। এই সকল পদার্থের মধ্যে অম্লজান এবং যবক্ষারজানই প্রধান। বায়ুর প্রায় ৩ ভাগ যবক্ষারজান ও ১ ভাগ অম্লজান। এতদ্ব্যতীত আর যে যে পদার্থ আছে তন্মধ্যে দ্ব্যম্লাঙ্গারকই উল্লেখযোগ্য। দুই ভাগ অম্লজান এবং একভাগ অঙ্গারক এই দুইয়ের সম্মিলনে দ্ব্যম্লাঙ্গারক বায়ুর উৎপত্তি। এই দ্ব্যম্লাঙ্গারক বায়ু আমরা প্রশ্বাসের সঙ্গে ত্যাগ করিয়া থাকি এবং উহা আমাদের পক্ষে বিষাক্ত। আবার আমাদের পক্ষে যাহা বিষাক্ত তাহাই বৃক্ষলতার পক্ষে হিতকারী। আমরা যাহা বিষাক্ত বলিয়া প্রশ্বাসের সঙ্গে পরিত্যাগ করিয়া থাকি তাহাই বৃক্ষগণ গ্রহণ করিয়া বাঁচিয়া থাকে। আবার বৃক্ষগণ মরিয়া পচিতে আরম্ভ করিলে তাহাদের দেহস্থ দ্ব্যম্লাঙ্গারক পুনরায় বায়ুমণ্ডলে মিশ্রিত হয়; এই প্রকার সর্ব্বদাই বায়ুমণ্ডল এবং প্রাণীজগতে দ্ব্যম্লাঙ্গারক বায়ুর আদান প্রদান চলিতেছে।

দ্ব্যম্লাঙ্গারক বায়ু ব্যতীত বায়ুমণ্ডলে সর্ব্বদাই কিছু না কিছু জলীয় বাষ্প বিদ্যমান থাকে। এই জলীয় বাষ্প আর কিছুই নহে—বাষ্পীভূত জলবিন্দু মাত্র। জলীয় বাষ্প কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়া বায়ুরাশিতে মিশ্রিত হয় তাহাই এখন আমাদের বিবেচ্য।

কেট্‌লিতে জল পুরিয়া নিম্নে উত্তাপ দিলে কতকক্ষণ পরে কেট্‌লির নলের মুখে ধোঁয়ার মত বাষ্প বাহির হইতে দেখা যায়, ইহা আর কিছুই নহে—উষ্ণ জলীয় বাষ্প। অনেকক্ষণ ধরিয়া উত্তাপ দিলে কেট্‌লীতে একটুও জল অবশিষ্ট থাকিবে

না। এই জল যায় কোথায়? নিশ্চয়ই বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায় এবং বায়ুরাশিতে মিশ্রিত হয়। এইরূপে উত্তাপ সংযোগে জল বাষ্প হইয়া সর্ব্বদাই বায়ুতে মিশ্রিত হইতেছে।

এক্ষণে বায়ুর উষ্ণতা এবং শৈত্যের কারণ কি তাহাই অনুসন্ধান করিতে হইবে। কতকক্ষণ রৌদ্রে থাকিলে আমাদের শরীর উষ্ণ হইয়া উঠে এবং আমরা উত্তাপ বোধ করি। ইহার কারণ রৌদ্রের তাপ। কিন্তু অনেক সময় ঘরে বসিয়া থাকিলেও উত্তাপ বোধ হয়। ইহার কারণ গৃহমধ্যস্থ বায়ুর উত্তাপ। বাহিরের বায়ু রৌদ্রের উত্তাপে উষ্ণ হইয়া উঠে, কিন্তু ঘরের মধ্যেত আর রৌদ্র নাই, তবে ঘরের বায়ু উত্তপ্ত বোধ হয় কেন? ইহার অনেক কারণ আছে। প্রথমতঃ রৌদ্রের সময় বাহিরের উত্তপ্ত বায়ু ঘরে প্রবেশ করিয়া ঘরকে উত্তপ্ত করিয়া তোলে। দ্বিতীয়তঃ রৌদ্রের তাপে গৃহের ছাদ ও দেওয়াল উত্তপ্ত হইলে তৎসংস্পর্শে গৃহের বায়ুও উষ্ণ হইয়া উঠে।

ঘরের বায়ুই হউক আর বাহিরের বায়ুই হউক উহা কখন উত্তপ্ত কখনও শীতল বোধ হয়। গ্রীষ্মকালে বায়ু এত উত্তপ্ত হয় যে গায়ে লাগিলে গা যেন পুড়িয়া যায়। আবার শীতকালে বায়ু এত শীতল যে গায়ে লাগিলে শরীর শীতে কাঁপিতে থাকে। আবার দিনের বেলায় যতটুকু উত্তাপ থাকে রাত্রিতে তাহা অনেক পরিমাণে কমিয়া যায়। এই প্রকার উত্তাপের হ্রাস বৃদ্ধি সর্ব্বদাই ঘটিতেছে। তাপমান যন্ত্রদ্বারা এই শৈত্য ও উষ্ণতার সহজেই পরিমাণ করা যায়।

সূর্য্যের তাপই বায়ুর উষ্ণতার প্রধান কারণ। সূর্য্যরশ্মি বায়ু-

মণ্ডল ভেদ করিয়া আসিবার কালীন উহার কতক উত্তাপ বায়ুরাশিকর্ত্তৃক গৃহীত হইয়া থাকে। কাজেই সূর্য্য-রশ্মির সংস্পর্শে বায়ুর উষ্ণতা বাড়িয়া যায়। আবার সূর্য্যের উত্তাপে উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠের সংস্পর্শে আসিয়া নিম্নস্থ বায়ু কতকটা উত্তপ্ত হয়। এইরূপে সাক্ষাৎ এবং পরোক্ষভাবে বায়ুর উষ্ণতা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। কিন্তু বায়ু একবার উষ্ণ হইলে কি প্রকারে পুনরায় শীতল হয় তাহাও দেখা দরকার।

রাত্রিকালে সূর্য্যের উত্তাপ থাকে না কাজেই রাত্রির বায়ু দিবাভাগের বায়ু হইতে অপেক্ষাকৃত শীতল। কিন্তু বায়ুর উষ্ণতা-হ্রাসের প্রধান কারণ বিকীরণ। দিনমানের শেষভাগে সূর্য্যের তাপ যখন কমিয়া আসে তখন ভূপৃষ্ঠ হইতে তাপ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। এজন্যই ভূপৃষ্ঠ ক্রমশঃ শীতল হইয়া থাকে এবং শীতল ভূপৃষ্ঠের সংস্পর্শে আসিয়া বায়ু-মণ্ডলও শীতল হয়। রাত্রি যত বেশী হয় শৈত্যও তত বাড়িতে থাকে এবং রাত্রিশেষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক শৈত্য অনুভূত হয়। এইরূপে দিবাভাগে সূর্য্যের উত্তাপজনিত উষ্ণতা এবং রাত্রিকালে তাপবিকীরণ বশতঃ শৈত্য—ইহাই প্রকৃতির নিয়ম।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে কোন জলপূর্ণ পাত্রের নিম্নে অগ্নি প্রয়োগ করিলে পাত্রস্থ জল সন্তপ্ত হইয়া প্রথমে ফুটিতে থাকে, পরে উষ্ণ বাষ্পে পরিণত হয়। কিন্তু অগ্নি ব্যতীত সূর্য্যের কিরণ সংস্পর্শেও জল বাষ্পে পরিণত হয়। আবার সূর্য্যের কিরণ না হইলেও কেবল বায়ুমণ্ডলের সংস্পর্শে জল জলীয় বাষ্পে পরিণত

হইতে পারে। তবে অগ্নি ও রৌদ্র সংস্পর্শে যেরূপ তাড়াতাড়ি হয় অন্যত্র তদ্রূপ হয় না।

একটী পাত্র জলে পূর্ণ করিয়া খোলা যায়গায় রাখিয়া দিলে কতক্ষণ পরে পাত্রটী শূন্য হইয়া যায়। তাহার কারণ পাত্রস্থ জল বাষ্পে পরিণত হইয়া উড়িয়া যায়। তবে পাত্রটী অগ্নির উপর বা রৌদ্রে রাখিলে যত শীঘ্র বাষ্পে পরিণত হইবে ছায়াতে রাখিলে তত শীঘ্র হইবে না। ভিজা কাপড় রৌদ্রে রাখিলে যে তাড়াতাড়ি শুকাইয়া যায় তাহারও ঐ কারণ।

জল যখন বাষ্পীভূত হয় তখন সঙ্গে সঙ্গে কতক উত্তাপও অপহরণ করিয়া লইয়া যায়। কাজেই জলীয় বাষ্প জল অপেক্ষা অধিকতর উষ্ণ। হাতের আঙ্গুলে এক ফোটা জল ধরিয়া রাখিলে কতকক্ষণ পরে জলটুকু উড়িয়া যায় এবং আঙ্গুলের যে অংশে জল ছিল তাহা শীতল বলিয়া অনুভূত হয়। শীতল জলে স্নান করিয়া খোলা গায়ে দাঁড়াইয়া থাকিলে গাত্রস্থ জল বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায় এবং বাষ্প হওয়ার কালে গাত্রস্থ উত্তাপ অপহরণ করিয়া থাকে। কাজেই শৈত্য অনুভূত হয়।

জলীয় বাষ্প যে কেবল উত্তাপ অপহরণ করিয়া লয় তাহা নহে উত্তাপ ধরিয়া রাখিবারও উহার ক্ষমতা আছে। সূর্য্যের উত্তাপ বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়াই পৃথিবীতে আসিয়া থাকে এবং বায়ুমণ্ডলস্থ জলীয় বাষ্পই সূর্য্যের কিরণ হইতে উত্তাপ ধরিয়া রাখে। বায়ুতে যদি জলীয় বাষ্প না থাকিত তবে সূর্য্যকিরণ বায়ুরাশি ভেদ করিয়া চলিয়া যাইত, তদ্দারা বায়ু উত্তপ্ত হইত না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি জল বাষ্পে পরিণত হইয়া বায়ুতে মিশিয়া যায়। এইরূপে নদী, পুকুর, খাল, বিল প্রভৃতি জলাশয় হইতে অবিরত বাষ্প উত্থিত হইয়া বায়ুরাশিতে মিশিতেছে। সুতরাং বায়ুতে সর্ব্বদাই কিছু না কিছু বাষ্প থাকে। একবারে বাষ্প-শূন্য বায়ু মরুভূমিতেও পাওয়া যায় না। কিন্তু কোনও নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের বায়ুতে কি পরিমাণ জলীয় বাষ্প থাকিতে পারে তাহার একটা সীমা আছে। বায়ুতে বাষ্পের পরিমাণ এই সীমা ছাড়াইয়া উঠিলে ঐ বায়ু আর বাষ্প ধারণ করিতে পারে না। তখন উক্ত বায়ুর সংস্পর্শে জলও আর বাষ্পে পরিণত হয় না। বর্ষাকালে বায়ু অত্যন্ত আর্দ্র থাকে। ঐ সময় ভিজা কাপড় শীঘ্র শুকায় না, কারণ বর্ষাকালের বায়ু অত্যধিক বৃষ্টি-নিবন্ধন জলীয় বাষ্পে পূর্ণ থাকে কাজেই ঐ বায়ু আর জলীয় বাষ্প ধারণ করিতে পারে না।

বায়ুর অবস্থাভেদে কখনও উহা অধিক পরিমাণ জলীয় বাষ্প ধারণ করিতে পারে আবার কখন অল্পপরিমাণ জলীয় বাষ্পেই উহা সিক্ত হইয়া যায়। প্রধানতঃ উষ্ণতার তারতম্য বশতঃ এই অবস্থাভেদ ঘটিয়া থাকে। বায়ু যত উষ্ণ হইবে তত উহা অধিক পরিমাণ বাষ্প ধারণ করিতে পারিবে, আবার যত শীতল হইবে তত উহার বাষ্পধারণের শক্তিও কমিয়া যাইবে। কাজেই কোনও কারণে উষ্ণ বায়ু শীতল হইতে থাকিলে ক্রমে ক্রমে এমন অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিতে পারে যখন ঐ বায়ুস্থিত জলীয় বাষ্প আর উহাতে থাকিতে পারে না, তখন অতিরিক্ত বাষ্প ঘনীভূত হইয়া জলরূপে পরিণত হইবে।

উপরে যে সমস্ত কথা বলা হইল তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিলে প্রাকৃতিক অনেক ঘটনার কারণ নির্ণয় করা যাইবে। বঙ্গদেশের উত্তর ও পূর্ব্বভাগ নদীবহুল ও নিম্নভূমি বলিয়া তথাকার বায়ু অপেক্ষাকৃত আর্দ্র। কারণ ঐ সকল নদী এবং জলাকীর্ণ স্থান হইতে সর্ব্বদাই জলীয় বাষ্প উত্থিত হইয়া বায়ুমণ্ডলে মিশ্রিত হইতেছে। পশ্চিম বঙ্গের বায়ু অপেক্ষাকৃত শুষ্ক, বিহার ও ছোটনাগপুরের বায়ু তদপেক্ষাও শুষ্ক। পূর্ব্ববঙ্গের বায়ু আর্দ্র অথচ উষ্ণ, কারণ বায়ুস্থিত জলীয় বাষ্প অনেক পরিমাণ উত্তাপ ধরিয়া রাখে। কিন্তু তথাকার দিবা ও রাত্রির অথবা গ্রীষ্ম ও শীতকালের উষ্ণতার তত পার্থক্য হয় না। কারণ দিবাভাগে জলীয় বাষ্প যেমন সূর্য্যের কিরণ হইতে উত্তাপ গ্রহণ করে, আবার রাত্রিবেলায় ভূপৃষ্ঠ হইতে যখন তাপ বিকীর্ণ হইতে থাকে তাহারও কিয়দংশ আট্‌কাইয়া রাখে। কাযেই উষ্ণতার তত পার্থক্য হইতে পারে না।

পক্ষান্তরে যে সব স্থানের বায়ু শুষ্ক তথায় দিবা ও রাত্রিতে বায়ুর উষ্ণতার অনেক পার্থক্য হয়। তাহার কারণ এই যে দিনের বেলায় সূর্য্যের কিরণে ভূপৃষ্ঠ অত্যন্ত উত্তপ্ত হয় এবং সেই উত্তপ্ত ভূপৃষ্ঠের সংস্পর্শে বায়ুরাশিও অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া উঠে। আবার যখন দিবাশেষে ভূপৃষ্ঠ হইতে তাপ বিকীর্ণ হইতে থাকে তখন সে তাপ বায়ুমণ্ডল ধরিয়া রাখিতে পারে না। কাজেই চারিদিকে তাপ ছড়াইয়া ভূপৃষ্ঠ যখন শীতল হইয়া পড়ে সেই শীতল ভূপৃষ্ঠের সংস্পর্শে উপরিস্থ বায়ুমণ্ডলও শীতল হয়। এইজন্যই দিবা ও রাত্রিতে শীতোষ্ণতার যথেষ্ট পার্থক্য হয়।

শুষ্ক বায়ুকে তৃষ্ণার্ত্তের সহিত তুলনা দেওয়া যাইতে পারে। তৃষ্ণার্ত্ত ব্যক্তি যেমন একটু জল পাইলে তাহা নিঃশেষে পান করিয়া ফেলে তেমন শুষ্ক বায়ুও জল পাইলেই অমনি তাহা শুষিয়া লয়। পক্ষান্তরে আর্দ্র বায়ু জলপানতৃপ্ত ব্যক্তির ন্যায়। প্রচুর জলপানে যাহার উদর পূর্ণ হইয়াছে আর অধিক জলপান তাহার পক্ষে একরকম অসম্ভব। সেইরূপ আর্দ্র বায়ু জলের সহিত সংস্পৃষ্ট হইলেও তাহা হইতে আর বাষ্প গ্রহণ করিতে পারে না।

আমাদের দেশে বিহার, ছোটনাগপুর প্রভৃতি প্রদেশের বায়ু অপেক্ষাকৃত শুষ্ক; এজন্য তথায় নদী, খাল, পুকুর প্রভৃতি জলাশয় শীঘ্রই শুকাইয়া যায়, কোন আর্দ্র জিনিষ রৌদ্রে রাখিলে অতিশীঘ্র শুষ্ক হয়, কোন জিনিষ সহজে পচিতে পারে না, মানবশরীরে গ্রীষ্মকালেও ঘর্ম্ম দেখা যায় না, কারণ চর্ম্মে একটু জল দেখা দিলেই অমনি বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায়। মাটীর কলসী বা অন্য কোন পাত্রে জল রাখিলে তাহা বেশ ঠাণ্ডা হইয়া থাকে। মাটীর পাত্র সচ্ছিদ্র বলিয়া ঐ ছিদ্রপথে বিন্দু বিন্দু জল পাত্রের গায়ে লাগিয়া থাকে এবং ঐ জলবিন্দু সমূহ উড়িয়া বাষ্প হওয়ার সময় পাত্রস্থ জল হইতে তাপ হরণ করিয়া লয়।

এক্ষণে আমরা শিশির, কুয়াসা প্রভৃতির কারণ অনেকটা বুঝিতে পারিব। আমাদের দেশে শীতকালে অনেক সময় গাছের পাতায়, ঘাসের উপর জলবিন্দুসমূহ দেখা যায়। বেশী শীতের সময় টপ্ টপ্ করিয়া ফোটা ফোটা জল পড়ে। এই জলবিন্দু কোথা হইতে আসিল? একটু অনুসন্ধান করিলেই ইহার কারণ

সহজে বুঝা যাইবে। মেঘহীন রাত্রিতে তাপ বিকীরণ হেতু ভূপৃষ্ঠ অত্যন্ত শীতল হয়। এই শীতল ভূপৃষ্ঠের সংস্পর্শে উপরিস্থ বায়ুরাশিও শীতল হইয়া থাকে। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে উষ্ণবায়ু যে পরিমাণ জলীয় বাষ্প ধারণ করিতে পারে শীতল বায়ু ততটা পারে না। কাজেই বায়ুরাশি শীতল হইলে তদন্তর্গত অতিরিক্ত বাষ্প ঘনীভূত হইয়া জলবিন্দুতে পরিণত হয়। এই সকল জলবিন্দু বৃক্ষ, পাতা, ঘাস, প্রস্তর প্রভৃতি বস্তুর উপর সংলগ্ন হইয়া থাকে। অধিক মাত্রায় সঞ্চিত হইলে পরে ফোটা ফোটা করিয়া পড়িতে থাকে।

অনেকে হয়তঃ মনে করেন যে বৃষ্টির ন্যায় শিশিরবিন্দুসমূহও উপর হইতে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। বাস্তবিক তাহা নহে। ভূপৃষ্ঠের বায়ুই শীতল হওয়াতে তদন্তর্গত জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া শিশিরবিন্দুতে পরিণত হয় এবং শীতল পদার্থের গায়ে সংলগ্ন হইয়া থাকে।

ভূপৃষ্ঠস্থ সকল পদার্থের উপর শিশিরবিন্দু সমানভাবে সঞ্চিত হয় না। যে বস্তু তাপ বিকীরণ হেতু যত অধিক পরিমাণে শীতল হয় তাহার গায়ে তত অধিক পরিমাণ শিশির সংলগ্ন হইয়া থাকে। নির্ম্মল ধাতুপাত্র সমূহ অধিক তাপ বিকীরণ করিতে পারে না। কাজেই ধাতুপাত্র রাত্রিকালে বাহিরে পড়িয়া থাকিলেও উহাতে অধিক শিশির সঞ্চিত হয় না। পক্ষান্তরে কাচপাত্র খুব তাড়াতাড়ি তাপ বিকীরণ করিয়া শীতল হয়, এজন্য কাচপাত্রে শিশিরও অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হয়। ঘাস, গাছের পাতা প্রভৃতি পদার্থেও এই কারণেই অধিক

পরিমাণে শিশির সঞ্চিত হইয়া ফোটা ফোটা করিয়া নিম্নে পড়িতে থাকে।

শীতকালে রাত্রিতে যে কুয়াসা দেখা যায় উহারও ঐ কারণ। অত্যধিক শৈত্য হেতু বায়ুস্থিত জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া অতি সূক্ষ্ম জলবিন্দুতে পরিণত হয়। তাহাই কুয়াসা-রূপে চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। আবার যখন দিবাভাগে সূর্য্যের তাপে বায়ুমণ্ডল উষ্ণ হইতে থাকে তখন শিশির বা কুয়াসারূপী জলবিন্দুসমূহ পুনরায় জলীয় বাষ্পে পরিণত হইয়া অদৃশ্য হয়। মেঘহীন রাত্রিতেই এই শিশিরপাত হয়, কিন্তু মেঘাচ্ছন্ন রাত্রিতে শিশিরপাত হয় না, কারণ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে ভূপৃষ্ঠ হইতে তাপ বিকীর্ণ হইয়া ঊর্দ্ধে চলিয়া যাইতে পারে না। কাজেই উপরিস্থ বায়ুরাশিও শীতল হইতে পারে না। বায়ু শীতল না হইলে তদন্তর্গত জলীয় বাষ্পও ঘনীভূত হইয়া জলবিন্দুরূপে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

কখনও নদীর তীরবর্ত্তী স্থানসমূহে দেখা যায় যে নদীর উপরিভাগ কুয়াসায় সমাচ্ছন্ন, কিন্তু নদীর উভয় তীরে তত কুয়াসা নাই। ইহার কারণ এই যে স্থলভাগ যত শীঘ্র উত্তপ্ত হয় জল তত সহজে উত্তপ্ত হয় না। আবার স্থলভাগ যত তাড়াতাড়ি তাপ বিকীর্ণ করিয়া শীতল হয় জল তত সহজে শীতল হয় না। কাযেই রাত্রিশেষে জলের উপরিস্থ বায়ু অপেক্ষাকৃত উষ্ণ এবং লঘু বলিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে এবং স্থল হইতে শীতল বায়ু আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে এবং এই শীতল বায়ুর সংযোগে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত

হইয়া কুয়াসার আকার ধারণ পূর্ব্বক নদীপৃষ্ঠ আবৃত করিয়া ফেলে।

শিশির, কুজ্ঝটিকা প্রভৃতি যে প্রাকৃতিক নিয়মের পরিণাম সেই নিয়মের পরিচয় অনেক সামান্য ঘটনাতেও পাওয়া যায়। শীতকালে মুখ হইতে ফু দিয়া বায়ু নিঃসরণ করিলে উহা ধোয়ার আকার ধারণ করিয়া বহির্গত হয়। ইহার কারণ এই যে মুখস্থিত উষ্ণ বায় জলীয় বাষ্পে পূর্ণ থাকে। বাহিরের শীতল বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া শীতল হইলেই উক্ত বায়ুস্থিত জলীয় বাষ্প ঘনীভূত হইয়া অতি সূক্ষ্ম জলবিন্দুতে পরিণত হয় এবং ঐ জলবিন্দুসমূহই ধোয়ার ন্যায় দেখায়। মুখ মেলিয়া শ্লেটের উপর ফু দিলে তথায় জলবিন্দু সঞ্চিত হইতে দেখা যায়। এইরূপ শীতল কাচখণ্ড উষ্ণ ঘরের ভিতর আনিলে তাহাতেও বিন্দু বিন্দু জল জমিয়া থাকে। এই সমস্ত ব্যাপারেরই কারণ এক।

যে কারণে শিশিরপাত এবং কুয়াসার সৃষ্টি হয়, মেঘ বৃষ্টিও ঠিক সেই কারণেই জন্মিয়া থাকে। প্রভেদ এই যে শিশির ও কুয়াসা ভূপৃষ্ঠের সন্নিকটে জন্মিয়া থাকে, পক্ষান্তরে মেঘমালার সৃষ্টি পৃথিবী হইতে বহু ঊর্দ্ধে। নদী, সরোবর প্রভৃতি জলাশয় হইতে সর্ব্বদা জলীয় বাষ্প উত্থিত হইয়া বায়ুরাশিতে মিশ্রিত হইতেছে। এই জলীয় বাষ্প ভূপৃষ্ঠের বায়ু অপেক্ষা লঘু। কাযেই উহা ক্রমশঃ ঊর্দ্ধদিকে উঠিতে থাকে। উঠিতে উঠিতে কোন কারণে শীতল হইলে জলীয় বাষ্প সূক্ষ্ম জলবিন্দুতে পরিণত হইয়া মেঘের সৃষ্টি করে। প্রধানতঃ তিনটী কারণে উষ্ণ বায়ু শীতল হয়। প্রথমতঃ যতই উপরে উঠিতে থাকে

ততই বায়ুর চাপের অল্পতা বশতঃ উহা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়াতে তাপের অপচয় ঘটে। দ্বিতীয়তঃ পথিমধ্যে শীতল বায়ুর সংস্পর্শেও উহার তাপের হ্রাস হইতে পারে। তৃতীয়তঃ আকাশের ঊর্দ্ধদেশ অত্যন্ত শীতল। কাজেই উষ্ণ বায়ু তথায় পৌঁছিলে আপনি শীতল হইয়া যায়।

অনেক সময় আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মেঘমালার গঠন লক্ষ্য করা যায়। প্রথমে হয়ত ক্ষুদ্র এক খণ্ড মেঘ দেখা গেল, দেখিতে দেখিতে উহা বড় হইতে লাগিল, আরও মেঘ-খণ্ডসকল আসিয়া উহার সহিত যোগ দিল। ক্রমে ক্রমে হয়ত ঐ মেঘমালাই বৃহদাকার ধারণ করিয়া গগনমণ্ডল ছাইয়া ফেলিল। কিন্তু ঐ সকল মেঘ আর কিছুই নহে জলাশয় হইতে উত্থিত জলীয় বাষ্পরাশির ঘনীভূত অবস্থা। ভূপৃষ্ঠে থাকিতে বায়ুর উষ্ণতা নিবন্ধন উহা বাষ্পাকারে ছিল, ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া শৈত্যসংস্পর্শে আপনার তাপ হারাইয়া ঘনীভূত অবস্থায় মেঘাকার ধারণ করিয়াছে।

গ্রীষ্মকালে অনেক সময় দেখা যায় যে প্রাতঃকালে আকাশে কোন মেঘ নাই। কিন্তু বেলা যতই বাড়িতে থাকে সঙ্গে সঙ্গে সূর্য্যের উত্তাপও বৃদ্ধি পায়। এই সূর্য্যোত্তাপে জলাশয় হইতে প্রভূত জলীয় বাষ্প জন্মিয়া উষ্ণ বায়ুর সহিত ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া মেঘের সৃজন করে। আবার সন্ধ্যাকালে সূর্য্যের উত্তাপ যখন কমিয়া যায় নিম্ন হইতে উষ্ণ বায়ুস্রোতের ঊর্দ্ধগমনও বন্ধ হয়। কাযেই মেঘখণ্ডগুলিও আর বৃদ্ধি পাইতে পারে না। তারপর নিম্নে অবতরণ করিয়া উষ্ণ বায়ুর সংস্পর্শে আসিলেই ক্ষীণাকার হইয়া

ক্রমশঃ মিলাইয়া যায়। এজন্য দিনের আকাশে মেঘ দেখা গেলেও রাত্রিতে অনেক সময় আকাশ মেঘশূন্য পরিষ্কার দেখা যায়। আবার মেঘ নিতান্ত লঘু বলিয়া বায়ুস্রোতের সঙ্গে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও চালিত হইয়া থাকে। কাযেই এক সময়ে যেস্থানে মেঘ দৃষ্ট হয় পরক্ষণেই হয়ত সেই স্থান পরিষ্কার হইয়া যায়।

কিন্তু অনেক সময় এইরূপ ভাবে মেঘের অদৃশ্য হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। তখন মেঘস্থিত জলীয়বিন্দুসমূহ ঘনীভূত হইয়া ফোটার আকার ধারণ করে এবং মাধ্যাকর্ষণ বলে বৃষ্টিরূপে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। কিরূপে সূক্ষ্ম জলবিন্দুসমূহ ঘনীভূত হইয়া থাকে তাহার কারণ পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে। শৈত্যসংযোগই এই ঘনীভবনের কারণ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে উষ্ণ বায়ু অধিক পরিমাণে জলীয় বাষ্প ধারণ করিতে পারে, কিন্তু বায়ু শীতল হইলে আর তৎপরিমাণ বাষ্প ধারণের শক্তি থাকে না, কাজেই অতিরিক্ত জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হইয়া জল-রূপে পরিণত হয়। মেঘের বেলায়ও তাহাই। আকাশমার্গে সঞ্চরণ করিতে করিতে যদি শীতল বায়ুর সংস্রববশতঃ অথবা অন্য কারণে উষ্ণতার লাঘব হয় তবে জলীয় বাষ্পরাশি আর মেঘাকারে উড্ডীয়মান থাকিতে পারে না, তখন ঘনীভূত হইয়া উঠে এবং সূক্ষ্ম জলবিন্দুসমূহ পরস্পর সংলগ্ন হইয়া ফোটার সৃজন করে এবং বায়ু অপেক্ষা ভারী বলিয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। ইহাকেই আমরা বৃষ্টি আখ্যা দিয়া থাকি।

কিন্তু কখন কখন শৈত্য এত বেশী হয় যে বৃষ্টির জল ভূপৃষ্ঠে

পতিত হওয়ার পূর্ব্বেই শৈত্যসংস্পর্শে কঠিন আকার ধারণ করিয়া শিলারূপে পরিণত হয়। তখন বৃষ্টির সঙ্গে শিলাপাত হইতে থাকে। অনেকেই হয়ত এই শিলাবৃষ্টি লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন। উষ্ণপ্রধান দেশে এই শিলাপাত বৃষ্টির সঙ্গেই ঘটিয়া থাকে, বিনা বৃষ্টিতে শিলাপাত প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু শীতপ্রধান দেশে শৈত্য এত বেশী হয় যে মেঘ হইতে জলবর্ষণ না হইয়া একবারে শিলাবৃষ্টি হইতে থাকে।

কখন কখন ভূপৃষ্ঠের নিকটস্থ বায়ুতে যে জলীয় বাষ্প থাকে তাহা জমিয়া কঠিন হইয়া বৃক্ষলতা, ঘরবাড়ী সমস্ত ঢাকিয়া ফেলে। এই প্রকার ঘটনাকে তুষারপাত বলে। আমাদের দেশে শীতকালে জলীয়বাষ্প জমিয়া শিশিরবিন্দুতে পরিণত হয় শীতপ্রধান দেশে কখন কখন জলীয়বাষ্প জমিয়া একবারে বরফ হইয়া যায় এবং এই বরফই শিশিরবিন্দুর ন্যায় ভূপৃষ্ঠকে ঢাকিয়া ফেলে।

আবার অত্যধিক শীতে নদী পুকুর প্রভৃতি জলাশয়ের জল জমিয়াও বরফ হইয়া যায়। বরফ জল হইতে পাত্‌লা বলিয়া জলের উপর ভাসিতে থাকে। শীত যত অধিক হইবে বরফও তত অধিক পরিমাণে জন্মিবে। ক্রমে ক্রমে হয় ত পুকুর প্রভৃতি জলাশয়ের সমস্ত জল বরফ হইয়া যাইতে পারে। এক-টুক্‌রা বরফ ভাঙ্গিয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে উহা শীতল, ভঙ্গপ্রবণ এবং স্বচ্ছ পদার্থ। কিন্তু অধিক পরিমাণ বরফ একত্র হইলে উহা অস্বচ্ছ দেখায়। কতটুকু বরফ আনিয়া ঘরে রাখিলে গৃহের উত্তাপ বশতঃ উহা গলিতে আরম্ভ করে এবং

পুনরায় জল হইয়া যায়। ঐ জল আবার উষ্ণবায়ুর সংস্পর্শে বাষ্পে পরিণত হয়। কাজেই দেখা গেল জলীয়বাষ্প, জল ও বরফ একই জিনিষ, কেবল উষ্ণতার বিভিন্নতায় উহারা বিভিন্ন আকার ধারণ করে। জলীয়বাষ্প শৈত্যসংযোগে জমিয়া জল হয়, জল জমিয়া বরফ হয়, আবার তাপসংযোগে বরফ গলিয়া জল হয় এবং জল বাষ্পে পরিণত হয়। এইরূপে প্রকৃতির মধ্যে আদান প্রদান চলিতেছে। জলাশয়সমূহ অবিরত আপনাদের দেহ হইতে জলীয়বাষ্প দান করিতেছে। জলীয়বাষ্প আবার মেঘরূপে আকাশে বিচরণ করিয়া বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে অবতরণ করিতেছে।

স্বাবলম্বন।

নিজের কায নিজে করিতে পারিলে তজ্জন্য পরের উপর নির্ভর করা কর্ত্তব্য নয়। অবশ্য, এমন অনেক কায আছে যাহা নিজে অথবা একাকী করা যাইতে পারে না। সেস্থলে বাধ্য হইয়াই অপরের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে। একটী গৃহ কেহ একাকী নির্ম্মাণ করিতে পারে না, একটী দেশ কেহ একাকী শাসন করিতে পারে না। এসকল বিষয়ে অপরের সাহায্য গ্রহণ করিতেই হইবে। কিন্তু যাহার যতটুকু নিজের কর্ত্তব্য উহার সমস্তই তাহাকে নিজে করিতে হইবে, তজ্জন্য অপরের মুখাপেক্ষী হইলে চলিবে না।

এই সংসারে আমাদের এত কাজ আছে যে প্রত্যেক কাজ করিবার ইচ্ছা থাকিলেও সমস্তগুলি একজনে করিয়া উঠিতে পারে না। কারণ সময় সীমাবদ্ধ, কিন্তু কাযের সীমা নাই। বিশেষতঃ সমস্ত কাজে হাত দিতে গেলে কোন কাজই ভালরূপ সম্পন্ন হইয়া উঠে না। এজন্যই কাযের বিভাগ করিয়া লইতে হয়। যিনি যে বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাহাকে সেই কাজই প্রধানভাবে করিতে হইবে, অপর কাজগুলি সুবিধামত এবং সাধ্যানুসারে সম্পন্ন করিলেই হইল। বাড়ীতে কাহারও অসুখ হইলে ডাক্তার ডাকিতেই হইবে, সেস্থলে স্বাবলম্বন করিলে চলিবে না। কিন্তু তাই বলিয়া যে কাজটা নিজেরই কর্ত্তব্য তাহা কখনও অপরের উপর ফেলিয়া রাখিবে না।

স্বাবলম্বন আমাদের স্বাভাবিক বৃত্তি। স্বাধীনতার ভাব-হইতেই উহার জন্ম। মানুষ সহজে পরের অধীন হইতে চায় না। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের কাজ নিজে করিতে পারে না, পরের উপর ফেলিয়া রাখে তাহার অপেক্ষা পরাধীন আর কে? আমরা সচরাচর দেখিতে পাই বাল্যকালে শিশুরা যতদিন শক্তিহীন থাকে ততদিনই অন্যের উপর নির্ভর করে। কিন্তু একটু শক্তিসঞ্চয় হইলেই তাহারা পরের সাহায্য পরি-ত্যাগ করিয়া স্বীয় চেষ্টার উপর নির্ভর করিতে আরম্ভ করে। বালক প্রথমে হাটিবার সময় অপরের সাহায্য গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু যেই একটু হাটিতে শিখিল অমনি ছুটাছুটী করিয়া বেড়ায়, তখন আর কাহারও সাহায্য গ্রহণ করিতে চায় না।

এইরূপে নিজের শক্তির উপর নির্ভর করিতে সকলেরই চেষ্টা করা কর্ত্তব্য, কারণ পরনির্ভর এবং পরাধীনতা একই কথা।

স্বাবলম্বন কর্ম্মশিক্ষার একটি প্রধান উপায়। স্বহস্তে নিজের কাজ করিলে যেরূপ শিক্ষা হয় তদ্রূপ শিক্ষা আর কিছুতেই হয় না। অনুশীলনদ্বারাই আমাদের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলি চরম উন্নতি লাভ করে এবং অনুশীলন অভাবে উহারা ক্রমশঃ মলিন এবং নিস্তেজ হইয়া যায়। শারীরিক অঙ্গগুলির সঞ্চালন না করিলে উহারা ক্রমশঃ দুর্ব্বল এবং শীর্ণ হয়। মানসিক বৃত্তিসম্বন্ধেও এই নিয়ম। সকল কার্য্য শিক্ষা করিতেই অভ্যাসের দরকার। সাঁতার শিখিতে হইলে জলে নামিয়া সাঁতার দিতে হইবে। তীরে বসিয়া কেহ সাঁতার শিখিতে পারে না। এইরূপ কোন কাজে দক্ষতা লাভ করিতে হইলে স্বয়ং সে কাজ করিতে হইবে।

স্বাবলম্বনে যেরূপ আনন্দ হয় তদ্রূপ আর কিছুতেই হয় না। কোন একটা কাজ নিজে করিতে পারিলে স্বতঃই একপ্রকার গৌরব অনুভূত হয় এবং অনির্ব্বচনীয় আনন্দ জন্মিয়া থাকে। বাল্যকালে দেখা গিয়াছে কোন একটা কঠিন অঙ্ক বা জ্যামিতিক অনুশীলন নিজের চেষ্টায় সমাধান করিতে পারিলে মনে অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয়। পক্ষান্তরে অপরের দ্বারা উহা সম্পাদন করাইয়া লইলে নিজের শক্তিহীনতা অনুভব করিয়া হৃদয় লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে। এ বিষয়ের যাথার্থ্য অনেকেই হয়ত নিজ জীবনে অনুভব করিয়াছেন।

নিজের কাজ নিজে করিতে পারিলে যে কেবল আনন্দলাভ

হয় তাহা নহে। ইহাতে আত্মশক্তির উপর একটা বিশ্বাস জন্মে এবং ভবিষ্যতে অন্য কার্য্যে হাত দিতেও কোন সঙ্কোচ বোধ হয় না। নিজের শক্তিতে বিশ্বাস কার্য্যসিদ্ধির মূলমন্ত্র। নিজের উপর যাহাদের বিশ্বাস নাই তাহারা কখনও কোন মহৎ কার্য্যের সূচনা বা সম্পাদন করিতে পারে না। আত্মশক্তির উপর অবিশ্বাস তাহাদিগকে আরও শক্তিহীন করিয়া ফেলে। কোন কার্য্য আমি পারিব না বলিয়া মনে করিলে তাহাতে কার্য্য-সম্পাদনের শক্তি অনেক কমিয়া যায়। আর যদি মনে করা যায় যে কেন পারিব না, অবশ্যই পারিব, তাহা হইলে শক্তিরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। শক্তির ধর্ম্মই এই।

স্বাবলম্বন ব্যতীত সংসারে অতি অল্পলোকেই উন্নতি লাভ করিতে পারে। এসংসার কেবল আমোদের স্থান নহে। ইহা কঠিন কর্ম্মযোগের স্থান। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় দেখা যাইবে, যাহারা পরিশ্রমী, নিজের শক্তিতে বিশ্বাসবান্ এবং আত্মশক্তি প্রয়োগ করিবার জন্য সতত সচেষ্ট তাহারাই সংসারে উন্নতি লাভ করিয়া থাকে। বাল্যে যাহারা যত্নপূর্ব্বক বিদ্যা উপার্জ্জন করে উত্তরকালে তাহারাই যশস্বী হয়। ব্যবসায় বাণিজ্যেও যাহারা পরিশ্রমী এবং নিজের কাজ নিজে দেখে তাহারাই উন্নতি লাভ করে। আর যাহারা আলস্যে বৃথা সময় নষ্ট করিয়া নিজের কাজ পরের উপর ফেলিয়া রাখে তাহারা চিরকাল দুঃখভোগ করিয়া থাকে।

যেসকল মহাত্মা এসংসারে নানা মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান-পূর্ব্বক অক্ষয় কীর্ত্তি উপার্জ্জন করিয়া গিয়াছেন তাহারা সকলেই

আত্মনির্ভরশীল ছিলেন। মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ইহার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। বিদ্যাসাগর অতি দরিদ্রের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যখন জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসিলেন তখন তিনি একবারে নিঃসম্বল। কিন্তু নিজের শক্তিতে ভর করিয়া অনেক কষ্টে তিনি লেখাপড়া শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং কালে কতদূর খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বিদ্যাসাগরের ন্যায় কতশত যুবক বাল্যে দারিদ্র্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া নিজের শক্তিতে ভর করিয়া উত্তরকালে যশস্বী হইয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। পক্ষান্তরে পরমুখাপেক্ষী ব্যক্তির সংসারে উন্নতি লাভ করা দূরে থাকুক তাহার কোনও কার্য্যই সুসম্পন্ন হয় না। নিজের কাযে নিজের যেরূপ আগ্রহ এবং উৎসাহ থাকিবে অপরের কখনও সে প্রকার উৎসাহ থাকিতে পারে না। যাহার উপর কার্য্যের ভার দেওয়া যায় সে যদি বেতনভোগী ভৃত্য হয় তবে সে মনে করে যে তাহার সম্বন্ধ বেতনের সঙ্গে, কোন রকম কাজ চালাইতে পারিলেই হইল, লাভ হউক লোকসান হউক সে ত প্রভুর, তাহার কি ? আর যদি ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তির কোনরূপ স্বার্থসম্বন্ধ না থাকে তবেত কথাই নাই। কাজ হইল কি না হইল তাহাতে তাহার কিছুই আসিয়া যাইবে না। এইরূপে পরনির্ভরশীল ব্যক্তির কার্য্য প্রায়ই নষ্ট হয়, আর কদাচিৎ সম্পন্ন হইলেও নিতান্ত অসম্পূর্ণ ভাবে সম্পন্ন হয়।

পরমুখাপেক্ষী ব্যক্তিকে সর্ব্বদাই অন্যের সাহায্য প্রার্থনা করিতে হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি অলস, যাহার নিজের কোনও

চেষ্টা নাই তাহাকে কেহ সাহায্য করিতেও প্রস্তুত হয় না। যাহার প্রকৃত অভাব তাহাকেই লোকে সাহায্য করে। অন্ধ, আতুর, কর্ম্মাক্ষম ব্যক্তিদিগকেই লোকে ভিক্ষা দিয়া থাকে। আর যাহাদের শরীর সবল, কার্য্য করিবার ক্ষমতা যথেষ্ট আছে তাহারা ভিক্ষা করিতে আসিলে ভিক্ষার পরিবর্ত্তে তাহাদিগের প্রতি অর্দ্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা করা কি কর্ত্তব্য নয়? প্রথমে নিজের শক্তি প্রয়োগ করিয়া দেখ, যদি না পার তবে অন্যের সাহায্য প্রার্থনা করিও। তাহা হইলে দেখিবে অন্যেও তোমাকে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবে না। ইংরাজীতে একটা কথা আছে God helps those who help themselves অর্থাৎ যাহারা নিজকে সাহায্য করে ভগবান তাহাদিগকে সাহায্য করেন। কথাটী অতি সত্য।

অলস ও নিশ্চেষ্ট ব্যক্তির অপরের নিকট কোন সাহায্য পাওয়া দূরে থাকুক সে সকলের ঘৃণার পাত্র। এইপ্রকার লোক সমাজের আবর্জ্জনা-স্বরূপ। নিজে কোনও চেষ্টা করিবে না, কেবল পরগাছার মত অন্যের স্কন্ধে ভর করিয়া তাহার উপার্জ্জিত অর্থে নিজের উদর পূর্ত্তি করিবে। নিজের কাজ নিজে করিবে না, অপরের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া নিশ্চিন্তমনে বসিয়া থাকিবে। যাহার সামান্য একটু আত্মসম্মান বোধ আছে সে কখনও অন্যের গলগ্রহ হইতে চায় না। ভিক্ষুকের মান কোথাও নাই।

পরমুখাপেক্ষীর মন সর্ব্বদা অশান্তিময়। তাহার ক্লেশ ভুক্তভোগী ব্যতীত অন্যে বুঝিতে পারে না। যে নিজে উপার্জ্জনাক্ষম, প্রত্যেক সাংসারিক অভাবপূরণের জন্য যাহাকে

পরের দিকে চাহিয়া থাকিতে হয় তাহার মনে কি কোন সুখ-শান্তি থাকিতে পারে? এরূপ লোককে প্রত্যেকেই অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকে এবং তাহার নিজের আত্মীয়স্বজন পর্য্যন্ত তাহাকে ধিক্কার দেয়। সংসার তাহার পক্ষে মরুভূমি এবং জীবন তাহার কাছে ভার বলিয়া বোধ হয়।

পরমুখাপেক্ষীর জীবন যদি এতই ঘৃণিত এবং অশান্তিময় তবে সকলেই আত্মনির্ভরশীল হয় না কেন? তাহার কতকগুলি কারণ আছে। অনেক স্থলে শক্তিহীনতা হইতে পরনির্ভরপ্রিয়তা জন্মিয়া থাকে। শক্তিহীনতা যদি প্রকৃতিদত্ত হয় তবে কিছুই বলিবার নাই। স্বভাবতঃ শক্তিহীন লোক কৃপার পাত্র হইতে পারে, কখনও ঘৃণার পাত্র নহে। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই আমাদের অকর্ম্মণ্যতা স্বকৃত অপরাধের ফল। যাহারা বাল্যকালে নিজে কোন কাজ করে না, পরের উপর নির্ভর করিয়া থাকে উত্তরকালে তাহারাই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। তখন অন্যের গলগ্রহ হওয়া ব্যতীত তাহাদের উপায়ান্তর থাকে না।

পরনির্ভরতার অপর কারণ আলস্য। এমন অনেক লোক আছে যাহাদের বুদ্ধিবৃত্তি খুব সতেজ, শারীরিক সামর্থ্যও যথেষ্ট আছে, কিন্তু কখনও কোন কাজ করিবার প্রবৃত্তি বা চেষ্টা নাই। এই সকল লোক বসিয়া বসিয়া অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট করিবে, শারীরিক ও মানসিক জড়তা উৎপাদন করিবে, হেয় লাঞ্ছিত জীবন যাপন করিবে, তথাপি অলসতা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় অবস্থার উন্নতি সাধন করিতে কোনও চেষ্টা করিবে না। এ প্রকার নিশ্চেষ্টতার প্রধান কারণ আলস্য।

ব্যক্তিগত জীবনে স্বাবলম্বন যেরূপ প্রয়োজনীয় জাতীয় বা সামাজিক জীবনেও তদ্রূপ। স্বাবলম্বনের অভাবে জাতীয় জীবন নিশ্চেষ্ট এবং জড়ভাবাপন্ন হইয়া ক্রমশঃ ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হয়। বিশেষতঃ আমাদের বর্ত্তমান সমাজে এই আত্ম-নির্ভরের বিশেষ প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে জীবন-সংগ্রাম এত কঠোর ছিল না, লোকসংখ্যা অল্প ছিল, সামান্য পরিশ্রমেই গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান হইত। লোকের অভাবও অতি সামান্য ছিল। পরিবারের মধ্যে একজন কৃতী হইলে অপর সকলে তাহার উপর নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিত। অনেকস্থলে দেখা যাইত পরিবারের একজন লোক উপার্জ্জন করিতেছে এবং তাহারই অর্থে পরিবারস্থ সকল লোক, এমন কি দূর আত্মীয় স্বজন পর্য্যন্ত প্রতিপালিত হইতেছে। আজকাল এ অবস্থার অনেকটা পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। একান্নবর্ত্তী পরিবার-প্রথা কতক পরিমাণে শিথিল হওয়াতে অনেকেই আপন আপন জীবিকাসংগ্রহের চেষ্টা করিতেছে। কাহারও বসিয়া থাকিবার যো নাই।

এবিষয়ে কতক উন্নতি হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃত স্বাবলম্বন-শিক্ষা এখনও আমাদের হয় নাই। স্বাবলম্বন সর্ব্বপ্রকার পরাধীনতার বিরোধী। কিন্তু এখনও আমরা চাকরিকেই সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানের কাজ বলিয়া মনে করি। এখনও আমরা দাসত্বকে প্রাণের সহিত ঘৃণা করিতে শিখি নাই। অবশ্য এমন অনেক লোক আছেন যাহাদিগকে অবস্থাধীনে বাধ্য হইয়া চাকরি স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু যাহারা ইচ্ছা করিলেই

কিছু মূলধন ব্যয় করিয়া কোন ব্যবসায়বাণিজ্যে যোগদান করিতে পারেন এরূপ লোকও চাকরির মোহ ত্যাগ করিতে পারেন না।

অন্যান্য বিষয়েও আমাদের পরনির্ভরপ্রিয়তার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। নিজের দেশে যেসকল রত্নরাজি আছে আমরা ভ্রমেও তাহার অনুসন্ধান করি না। আমাদের শাস্ত্র আমরা আলোচনা করি না। বিদেশী পণ্ডিতগণ আমাদের শাস্ত্রসমূহ বিদেশী ভাষায় অনুবাদ করিলে আমরা সেই অনুবাদ মুখস্থ করিয়া নিজেদের পাণ্ডিত্যের অভিমানে ধরাকে সরা জ্ঞান করিতে শিখি। বিদেশী মহাত্মাগণ আসিয়া আমাদের জন্য স্কুল কলেজ স্থাপন না করিলে আমাদের সন্তানসন্ততিগণের শিক্ষালাভের সুযোগ ঘটিয়া উঠে না।

শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়েও আমরা সম্পূর্ণ পরাধীন। দেশের শিল্প ও বাণিজ্য পরের হাতে তুলিয়া দিয়া আমরা নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া আছি। মাঞ্চেষ্টার আমাদের কাপড় যোগাইবে তবে আমরা লজ্জা নিবারণ করিব, বার্মিংহাম আমাদের লেখনী প্রস্তুত করিবে তবে আমরা আপিসে যাইয়া রাশি রাশি কাগজপত্র নকল করিয়া নিজকে ধন্য মনে করিব। লিভারপুল লবণ পঠাইলে আমাদের ব্যঞ্জন রন্ধন হইবে, নচেৎ মুখের ভাত হাতে তুলিয়া বসিয়া থাকিব। বাস্তবিক এত বড় অসহায় এবং পরপ্রত্যাশী জাতি ভূমণ্ডলের আর কোথাও আছে কি না সন্দেহ।

কেবল যে শিল্পবাণিজ্য সম্বন্ধে আমরা উদাসীন তাহা নহে।

যে সব কাজ বহুলোকের সম্মিলিত চেষ্টাব্যতীত সম্পন্ন হওয়ার সম্ভাবনা নাই তাহাদের অনেক বিষয়েই আমরা পরের মুখের দিকে চাহিয়া আছি। এমন কি আমাদের যে সকল সামাজিক আচারব্যবহারের সংস্কার দরকার তাহাও আমরা নিজেরা করিয়া উঠিতে পারি না। এমন লোকও অনেক আছেন যাহারা এইসকল সংস্কারের জন্য গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করিতেও সঙ্কুচিত হইবেন না। সকল বিষয়েই আমরা আলস্য এবং জড়তার প্রতিমূর্ত্তি হইয়া বসিয়া আছি।

যাহাহউক অনেক দিনের মোহনিদ্রার পর আজকাল আমাদের একটু চোখ্ ফুটিয়াছে। বহুকাল পরে আমরা বুঝিতে পারিয়াছি যে স্বাবলম্বন ভিন্ন কি ব্যক্তিগত কি জাতীয় কোন প্রকার উন্নতিই লাভ করা যায় না। তাই চারিদিকে স্বাবলম্বনের এক আধটু চিহ্ন দেখা যাইতেছে। কেহ কেহ দেশে কল কারখানা স্থাপন করিয়া শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। ইতিমধ্যেই অনেকগুলি যৌথ কারবার স্থাপিত হইয়াছে। অনেক উৎসাহী যুবক ইংলণ্ড, জাপান, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়া কৃষি, শিল্প; বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়ে সুশিক্ষিত হইয়া আসিতেছেন। চারিদিকে শুভলক্ষণ দেখা যাইতেছে। আশা করা যায় অচিরকালমধ্যেই আমরা জগতের প্রধান প্রধান স্বাবলম্বী এবং উন্নতিশীল জাতির মধ্যে আসন গ্রহণ করিতে পারিব।

এ বিষয়ে জাপান আমাদের আদর্শস্থানীয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জাপান নিজের চেষ্টায় যেরূপ উন্নতি লাভ

করিয়াছে তাহা বিস্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই। অল্পদিন পূর্ব্বে যে জাপান অসভ্য বলিয়া পরিচিত ছিল আজ সে জ্ঞানে বিজ্ঞানে, শক্তি সামর্থ্যে পাশ্চাত্য সর্ব্বপ্রধান জাতিসমূহের সহিত সমকক্ষতা করিতেছে। চক্ষের সন্নিকটে জাপানের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়াও যদি আমাদের চৈতন্যসম্পাদন না হয় তবে নিতান্তই দুর্ভাগ্যের বিষয়। আমাদিগকে সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে স্বাবলম্বনই ব্যক্তিগত এবং জাতীয় উন্নতির মূল।

রাজা রামমোহন রায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে হুগ্‌লী জেলার খানাকুল কৃষ্ণনগর সন্নিহিত রাধানগর গ্রামে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন। রামমোহনের পিতার নাম রামকান্ত রায়, মাতার নাম তারিণী দেবী। কিন্তু সাধারণ লোকে তারিণী দেবীকে ফুল ঠাকুরাণী বলিয়া ডাকিত। রামকান্ত রায় সঙ্গতিপন্ন লোক ছিলেন, এবং বর্দ্ধমানের রাজার নিকট হইতে কৃষ্ণনগর ও তৎসন্নিহিত মৌজাসমূহের ইজারা গ্রহণ করিয়া সর্ব্বত্র জমিদার বলিয়াই পরিচিত ছিলেন। রামকান্তের তিন পুত্র—জ্যেষ্ঠ জগন্মোহন, মধ্যম রামমোহন এবং কনিষ্ঠ রামলোচন। রামমোহনের মাতা অনেক সদ্‌গুণের অধিকারিণী ছিলেন। তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও তেজস্বিতা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ছিল। স্বামীর

মৃত্যুর পর জমিদারী নিজ হস্তে গ্রহণ করিয়া অনেক দিন শৃঙ্খলার সহিত শাসন করিয়াছিলেন। প্রচলিত ধর্ম্মের উপর তাঁহার অবিচলিত নিষ্ঠা ছিল। বৃদ্ধকালে একাকিনী পদব্রজে পুরীতে গমন করিয়া শেষ জীবন তথায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। দীর্ঘ একবৎসর কাল নিজহস্তে জগন্নাথ দেবের মন্দির পরিষ্কার তাঁহার প্রাত্যহিক কর্ম্মের মধ্যে গণ্য ছিল। পুত্রের সহিত ধর্ম্মবিষয়ে মতবিরোধ হওয়াতে প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে পুত্রকে বর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। মাতার এই বুদ্ধি, তেজস্বিতা এবং ধর্ম্মনিষ্ঠা সমস্তই পুত্রে সংক্রমিত হইয়াছিল। উপযুক্ত পিতামাতার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই রাম-মোহন উত্তরকালে স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

যে সময়ে রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন তখন বঙ্গদেশের নিতান্তই শোচনীয় অবস্থা। দেশে অশান্তি এবং অরাজকতা; সমাজে অজ্ঞানতার অন্ধকার এবং নৃশংস দেশাচারের প্রবল দৌরাত্ম্য। তখনও ইংরাজ রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। দূর পল্লীগ্রামে জমিদারবর্গের একাধিপত্য। সর্ব্বত্র চোর ডাকাতের প্রাদুর্ভাব। যাহারা রক্ষক তাহারাই ভক্ষক। সেই সময়ে যে সকল ইংরাজ রাজকার্য্য উপলক্ষ্যে এ দেশে আগমন করিত, প্রায়শঃ সুশাসন অপেক্ষা অর্থোপার্জ্জনের দিকেই তাহাদের অধিকতর দৃষ্টি ছিল। যথেষ্ট অর্থ শোষণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যা-বর্ত্তনপূর্ব্বক "নবাব" বলিয়া পরিচিত হওয়াই অনেকের প্রধান আকাঙ্খার বিষয় ছিল। এ অবস্থায় যে সর্ব্বত্র অরাজকতার প্রাদুর্ভাব হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

সমাজের অবস্থা আরও শোচনীয় ছিল। সমাজ তখন কুপ্রথা, কুআচার এবং কুসংস্কারের দাসত্বনিগড়ে বদ্ধ। গঙ্গাসাগরে সন্তাননিক্ষেপ তখন পুণ্য কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবারা ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়া স্বর্গের পথ উন্মুক্ত করিতেন। ধর্ম্ম কতকগুলি ক্রিয়াকাণ্ড এবং দেশাচারের নিয়মপালনে পর্য্যবসিত হইয়াছিল, কখন কখনও ধর্ম্মের নামে অনেক অমানুষিক বীভৎস কাণ্ডের অনুষ্ঠান হইত। দেশে সাধারণ শিক্ষার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলেরা কেহ কেহ সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করিয়া অধ্যাপকের পদবী গ্রহণ করিত, আর যাহারা রাজকার্য্যে যশঃ এবং অর্থলাভের আশা রাখিত তাহারা আরবী এবং পারসী ভাষায় ব্যুৎপত্তিলাভের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিত। জনসাধারণ শিক্ষার বড় ধার ধারিত না। জীবনসংগ্রাম এখনকার মত কঠোর ছিল না, কাজেই গৃহে বসিয়া গ্রাম্য আমোদ প্রমোদে জীবনটা কাটাইয়া দিতে পারিলেই আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিত। এমন কি রাজধানী কলিকাতাতেও সম্ভ্রান্ত এবং সম্পন্ন ব্যক্তিসমূহ মল্লক্রীড়া ও বুলবুলির লড়াই এবং যাত্রা, কবি, পাঁচালীর আসরে যোগদান করিয়া খ্যাতি অর্জ্জনকেই জীবনের প্রধান কার্য্য বলিয়া মনে করিত। মোটের উপর সেই সময়টাকে নব্যবঙ্গের অন্ধকারের যুগ আখ্যা দেওয়া যাইতে পারে। তবে পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল এবং ইংরাজরাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং সভ্যতা ধীরে ধীরে প্রসার লাভ করিতেছিল।

এই পরিবর্ত্তনের উষালোকে যখন পূর্ব্বাকাশ রঞ্জিত হইয়া উঠিতেছিল তখন রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম। রাজা রাম-মোহন দেশের জন্য কি করিয়াছেন এবং নব যুগের ইতিহাসে রামমোহনের স্থান কোথায় তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইবার জন্যই আমরা দেশের তাৎকালীন অবস্থার একটু আভাস প্রদান করিলাম।

রামমোহনের বাল্যজীবনের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ হয় নাই। এই মাত্র জানা যায় যে শিশুকালে গুরুমহাশয়ের পাঠশালাতেই তাঁহার হাতে খড়ি হয় এবং পিতৃগৃহেই তিনি আরবী ও পারসী ভাষায় কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করেন। শৈশব-কালেই তাঁহার প্রখর বুদ্ধি এবং মেধাশক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। তাঁহার পিতার ইচ্ছা ছিল তিনি আরবী এবং পারসী ভাষাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া সরকারী কার্য্যে প্রবেশ লাভ করেন। এজন্য নবম বৎসর বয়সে তিনি বালক পুত্রকে আরবী ও পারসী ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিবার জন্য পাটনায় প্রেরণ করেন। এই ঘটনাতে রামমোহনের নির্ভীকতা এবং একনিষ্ঠার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তখনকার কালে পাটনার ন্যায় দূরস্থানে যাতায়াত সহজসাধ্য ছিল না। নবমবর্ষীয় বালকের পক্ষে তাহা কতদূর দুরূহ তাহা সহজেই অনুমেয়। অন্য বালক হইলে হয়ত কাঁদিয়াই আকুল হইত। কিন্তু রামমোহন এই কচি বয়সে গ্রামের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া আরবী পারসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তিলাভের জন্য নিঃসঙ্কোচচিত্তে পাটনায় গমন করিয়া-ছিলেন। ইহা রামমোহনের পক্ষেই সম্ভব।

তিন বৎসর কাল পাটনায় থাকিয়া তিনি আরবী ও পারসী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিলেন। এই সময়েই মুসলমান ধর্ম্মগ্রন্থ-পাঠে তাঁহার চিত্তে একেশ্বরবাদের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব সর্ব্বপ্রথম অঙ্কুরিত হইয়াছিল।

পাটনায় আরবী ও পারসী ভাষা শিক্ষা করিয়া ১৭৮৬ অব্দে দ্বাদশবর্ষ বয়সে রামমোহন সংস্কৃত ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিবার জন্য কাশীতে যাত্রা করিলেন। তথায় তিন বৎসর কাল থাকিয়া বেদান্ত এবং উপনিষৎ প্রভৃতি দর্শনশাস্ত্রসমূহ মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করেন। পঞ্চদশবর্ষীয় বালকের পক্ষে এই সকল গভীর তত্ত্বের আলোচনা নিতান্তই বিস্ময়কর। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি রামমোহন অদ্ভুত অমানুষী প্রতিভা লইয়া জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন, কাজেই যাহা সাধারণ লোকের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হয় রামমোহন তাহা অবলীলাক্রমে সম্পাদন করিয়াছেন।

কাশীহইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক রামমোহন ধর্ম্ম-সম্বন্ধে অনেক চিন্তা করেন। এই সময়হইতেই প্রচলিত ধর্ম্ম এবং অনুষ্ঠানে তাঁহার অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল এবং একেশ্বর-বাদের মহান্ ভাব তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠিয়াছিল। তিনি প্রচলিত ধর্ম্মসম্বন্ধে প্রায়ই পিতার সহিত তর্ক বিতর্ক করিতেন।

পূর্ব্বপুরুষের ধর্ম্মসম্বন্ধে এই প্রকার বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করাতে রামমোহনের পিতা নিতান্তই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন এবং পুত্রের মতপরিবর্ত্তনের কোনও সম্ভাবনা নাই দেখিয়া তাঁহাকে গৃহহইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

পিতৃগৃহ হইতে তাড়িত হইয়া রামমোহন ভারতের নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে হিমালয় পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া তিব্বতে প্রবেশ করিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভই তাঁহার তিব্বতগমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কথিত আছে লামাদের চক্রান্তে তিব্বতে এক সময়ে তিনি বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তিব্বতবাসিনী রমণীদের সহায়তালাভে বিপন্মুক্ত হন। তদবধি চিরজীবন স্ত্রীজাতির প্রতি তিনি গভীর শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিয়াছেন।

চারি বৎসর কাল বিদেশে ভ্রমণ করিয়া ১৭৯৪ অব্দে বিংশতি বৎসর বয়সে তিনি গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পিতা পুত্রে পুনরায় মিলন সংঘটিত হইল। এই সময়ে রামমোহন রায়ের বিবাহ হয়।

বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়াও রামমোহন গৃহে বেশীদিন তিষ্ঠিতে পারিলেন না। অবিলম্বে পিতার সহিত পুনরায় ধর্ম্ম-সম্বন্ধে মতভেদ ঘটিল। বৃদ্ধ রামকান্ত মনে করিয়াছিলেন যে বিদেশে বহু ক্লেশভোগের পর পুত্রের মতিগতি নিশ্চয়ই পরি-বর্ত্তিত হইবে এবং তিনি পৈত্রিক ধর্ম্মে ক্রমশঃ আস্থাবান্ হইয়া উঠিবেন। কিন্তু সে আশায় নিরাশ হইয়া তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিলেন, কাজেই রামমোহনকে পুনরায় গৃহ ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইল। এই নির্ব্বাসিত অবস্থায়ও পিতার নিকট হইতে কিছু কিছু অর্থসাহায্য পাইতেন।

এই ভাবে কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল, কিন্তু অর্থকৃচ্ছ্রতা ক্রমশঃই তাহাকে পীড়া দিতে লাগিল, কাজেই রামমোহনকে

বাধ্য হইয়া চাকরীর অন্বেষণ করিতে হইল। জন ডিগ্‌বী সাহেব তখন রংপুরের কালেক্টার। তাঁহারই নিকট রামমোহন কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইলেন। তখনকার সময় সাহেবেরা অধীনস্থ কর্ম্মচারীর সহিত বড়ই অশিষ্ট ব্যবহার করিত। রামমোহন তাহা সহ্য করিবেন কেন? আত্মসম্মানরক্ষার দিকে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল; কাজেই ডিগ্‌বী সাহেবের নিকট প্রস্তাব করিলেন যে তিনি যখনই সাহেবের নিকট উপস্থিত হইবেন তখনই তাঁহাকে আসন প্রদান করিতে হইবে, এরূপ সর্ত্ত লেখাপড়া করিয়া দিলে তিনি কর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারেন। ডিগ্‌বী সাহেব এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তদ্রূপ সর্ত্ত লিখিয়া দিয়া রামমোহনকে কেরানীর পদে নিযুক্ত করিলেন।

যত্ন ও উৎসাহের সহিত গবর্ণমেণ্টের কার্য্য সম্পাদন করিয়া রামমোহন শীঘ্রই দেওয়ানের পদে উন্নীত হইলেন। ডিগ্‌বী সাহেব তাঁহার কার্য্যে বড়ই সন্তুষ্ট ছিলেন এবং রামমোহনকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহাদের পরস্পর অনুরাগ ক্রমে বন্ধুত্বে পরিণত হইল এবং এই বন্ধুত্ব আজীবন স্থায়ী হইয়াছিল।

সরকারী কার্য্যের জন্য এসময় তাঁহাকে ইংরাজি শিক্ষা করিতে হইয়াছিল। তিনি বাইশ বৎসর বয়সে প্রথম ইংরাজি শিখিতে আরম্ভ করেন,কিন্তু পাঁচ ছয় বৎসর বিশেষ কোন উন্নতি করিতে পারেন নাই। ডিগ্‌বী সাহেবের অধীনে দেওয়ান নিযুক্ত হওয়ার পর সাহেবদের চিঠিপত্র পাঠ করিয়া ইংরাজী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠেন।

১৮০০ সাল হইতে ১৮১৩ সাল পর্য্যন্ত রামমোহন রায়

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। ইহার মধ্যে দশ বৎসর কাল তিনি রংপুর, ভাগলপুর ও রামনগরে কালেক্টারের দেওয়ানের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বিচক্ষণ এবং সুদক্ষ কর্ম্মচারী বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। বহু অর্থ সঞ্চয় পূর্ব্বক ১৮১৩ অব্দে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া তিনি কলিকাতা মাণিকতলায় বাসস্থান নিরূপিত করেন এবং তদবধি রাজধানীতে বাস করিয়া ধর্ম্মপ্রচার, সমাজসংস্কার, শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি শুভকার্য্যে জীবনের অবশিষ্ট কাল ব্যয় করিয়াছিলেন।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যোপলক্ষ্যে মফঃস্বলে অবস্থানকালেও রামমোহন তাঁহার জীবনের মহাব্রত একেশ্বরবাদপ্রচার কখনও বিস্মৃত হন নাই। রংপুরে তিনি একটী ব্রাহ্মসভা স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সন্ধ্যার পর বন্ধুবর্গকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে পৌত্তলিকতার অসারতা এবং ব্রহ্মজ্ঞানের আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিতেন। এই প্রকারে যখনই সুবিধা পাইতেন তখনই নানা উপায়ে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রচার তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল। যে মহৎ কার্য্য সাধনের জন্য তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন জীবনের সকল অবস্থায় এবং সকল ঘটনার মধ্যেই সেই ব্রত উদ্‌যাপনের যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

এই সময়ে কয়েকটী পারিবারিক ঘটনা তাঁহাকে বড়ই বিব্রত করিয়াছিল। ১৮০৪ সালে তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। পিতৃবিয়োগের পর কিছু দিন তিনি পিতৃগৃহেই বাস করিয়াছিলেন। কিন্তু বিধর্ম্মী পুত্রের সহিত একত্র বাস করিতে তাঁহার মাতা সম্মত হইলেন না। কাজেই পিতৃগৃহ পরিত্যাগ

করিয়া রামমোহন রঘুনাথপুরে আপন আবাসবাটী নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহার পুত্রের বিবাহেও অত্যন্ত দলাদলি হইয়াছিল, কিন্তু প্রতিপক্ষগণ বিশেষ কোনও অনিষ্ট সাধন করিতে পারে নাই; নানাপ্রকারে লাঞ্ছিত ও উৎপীড়িত হইয়াও রামমোহন রায় আপন ধর্ম্মবিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, এবং এই সকল অত্যাচার এবং উৎপীড়ন তাঁহার মহত্ত্বকে আরও মহীয়ান্ করিয়া তুলিয়াছিল।

১৮১৪ সালে চল্লিশ বৎসর বয়সে রামমোহন রায় কলিকাতায় স্থায়ী বাসস্থান প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময় হইতে তাঁহার প্রকৃত কর্ম্মজীবনের আরম্ভ। যে অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী হইয়া তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং আশৈশব যে শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন সমস্ত এক্ষণ স্বদেশের সেবায় নিয়োজিত করিয়া অধঃপতিত সমাজের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিসাধনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সাধারণের হিতকর এমন কোনও বিষয় ছিল না যাহাতে তিনি যোগদান করেন নাই এবং তাঁহার জীবনকালে এমন কোনও সাধারণের শুভকর কার্য্য সম্পাদিত হয় নাই যাহার সহিত তিনি কোন প্রকারে সংসৃষ্ট ছিলেন না।

রামমোহনের জীবনের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা। অনেক দিন হইতেই নানাপ্রকারে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রচার করিতেছিলেন। কিন্তু কলিকাতায় আসিয়া বুঝিতে পারিলেন যে একটী স্থায়ী উপাসনামন্দির এবং ধর্ম্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে কেবল তর্কবিতর্ক বা পুস্তিকা

প্রচার দ্বারা বিশেষ কোনও কার্য্য হইবে না। এজন্য বন্ধুবর্গের সহিত মিলিত হইয়া তিনি অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। যথেষ্ট অর্থ সংগৃহীত হইলে মন্দিরনির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ হইল। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১১ই মাঘ তারিখে নবনির্ম্মিত মন্দিরে নূতন ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য প্রথম আরব্ধ হয়। এখনও ঐ দিবস বিভিন্ন ব্রাহ্মসমাজে সাম্বাৎসরিক উৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে।

রামমোহন রায় যে কেবল ধর্ম্মপ্রচারেই ব্যাপৃত ছিলেন তাহা নহে। সর্ব্বপ্রকার সমাজসংস্কারের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠভাবে সংসৃষ্ট ছিলেন। তন্মধ্যে সতীদাহপ্রথা নিবারণের জন্য তিনি যে অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছেন তাহা আজিও সকলের শ্রদ্ধা এবং ভক্তি আকর্ষণ করিতেছে। পূর্ব্বকালে কোন উচ্চ-শ্রেণীর হিন্দু ভদ্রলোকের মৃত্যুর পর তদীয় বিধবা পত্নী স্বামীর সহিত জ্বলন্ত চিতায় প্রবেশপূর্ব্বক প্রাণ বিসর্জ্জন করিলে তাহা নিতান্ত পুণ্যকার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত। কিন্তু সকল স্থলেই যে বিধবাগণ স্বেচ্ছায় এইরূপ দেহত্যাগ করিতেন তাহা নহে। অনেকস্থলে নানা প্রলোভন ও ভয় প্রদর্শন করিয়া বিধবাদিগকে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত করান হইত। কোন কোন স্থলে তজ্জন্য অবৈধ বলপ্রয়োগও করা হইত। এই নৃশংস দেশাচার কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল, কিন্তু পাছে হিন্দুদিগের ধর্ম্মানুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করা হয় এই ভয়ে গভর্ণমেণ্ট কোন আইন বিধিবদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। রামমোহন রায় কলিকাতায় আসিয়াই ইংরাজী ও বাঙ্গালা ভাষায় সতীদাহপ্রথার বিরুদ্ধে নানাবিধ পুস্তক প্রচার

করিতে লাগিলেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম পুস্তক প্রচারিত হয় এবং তাঁহার শেষ পুস্তক ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল। এই সকল পুস্তকপ্রচারদ্বারা রামমোহন রায় প্রমাণ করেন যে সতীদাহ ন্যায় ও ধর্ম্ম বিরুদ্ধ। এই তীব্র আন্দোলনের ফলে ১৮২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্কের শাসনকালে এই কুপ্রথা আইনদ্বারা নিবারিত হয়। রাজা রামমোহন রায় কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিককে এক অভিনন্দন প্রদান করেন। তাহাতে দেশীয় বহু সম্ভ্রান্ত লোকের স্বাক্ষর ছিল। সতীদাহ ব্যতীত বহুবিবাহ, কন্যাবিক্রয় প্রভৃতি কুপ্রথার বিরুদ্ধেও রাজা রামমোহন রায় তাঁহার লেখনী চালনা করিয়াছিলেন, এবং হিন্দুনারীগণ যাহাতে স্বামীর প্রাপ্ত সম্পত্তিতে স্বত্ব লাভ করিতে পারেন তজ্জন্য রামমোহন রায় যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি এদেশীয় নিরাশ্রয় অবলাকুলের প্রকৃত বন্ধু ছিলেন এবং চিরজীবন দুঃখিনী বঙ্গরমণীর দুঃখ দূর করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন।

তারপর শিক্ষাবিস্তার এবং বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য রামমোহন রায় যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহা স্মরণ করিলে আমাদের হৃদয় কৃতজ্ঞতাভারে অবনত হয়। যে ইংরাজী শিক্ষা আমাদের দেশে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে তাহারও মূলে রাজা রামমোহন রায়। লর্ড আমহার্ষ্টের শাসনসময়ে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট এদেশে শিক্ষাবিস্তারের জন্য কতক টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। কেহ কেহ প্রস্তাব করিল এই অর্থ দেশীয়

ভাষা শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হউক। কিন্তু রাজা রামমোহন রায় এই বিষয়ে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে লর্ড আমহার্ষ্টকে যে পত্র লিখেন তাহাতে ইংরাজী শিক্ষার আবশ্যকতা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হয়। এই পত্রখানা রামমোহনের অদ্ভুত দূরদর্শিতার নিদর্শন। শিক্ষাবিস্তারের জন্য তিনি আরও অনেক কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি বেদশিক্ষার জন্য একটী বেদবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। হিন্দুকলেজস্থাপনের তিনিও একজন প্রধান উদ্যোগী। অনেকদিন উক্ত কলেজ কমিটির সভ্য ছিলেন, কিন্তু কেহ কেহ আপত্তি উত্থাপন করিলে তিনি স্বীয় উদারতাগুণে উক্ত কমিটির সভ্যপদ ত্যাগ করেন। রামমোহন রায় ডফ্ সাহেবের স্কুলস্থাপনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন, এবং সময় সময় নিজে উপস্থিত হইয়া উক্ত স্কুলের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তাঁহার নিজেরও একটী ইংরাজী স্কুল ছিল এবং তিনি নিজেই উহার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করিতেন।

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির জন্য রামমোহনের চেষ্টা অতীব প্রশংসনীয়। বাস্তবিক পক্ষে তিনিই সাধু বাঙ্গালা গদ্যের প্রথম প্রবর্ত্তক। তাহার পূর্ব্বেও দুই এক খানা গদ্যগ্রন্থ প্রচলিত ছিল, কিন্তু বাঙ্গালা গদ্যে সাধারণের পাঠ্য পুস্তক রাজা রামমোহন রায়ই প্রথম প্রকাশিত করেন। কাজেই বলিতে হইবে যে বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির মূলে রাজা রামমোহন রায়। সাহিত্য ব্যতীত তিনি বাঙ্গালা ভাষার একখানা ব্যাকরণও লিখিয়াছিলেন, এবং তিনিই সর্ব্বপ্রথম ভাষায় কমা প্রভৃতি চিহ্নের ব্যবহার প্রচলিত করেন।

বাঙ্গালা সাময়িক পত্রের ইতিহাসেও রামমোহনের স্থান অতি উচ্চে অবস্থিত। তিনি সংবাদকৌমুদী নামে একখানা পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। উক্ত পত্রিকায় রাজনীতি, ধর্ম্মনীতি, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি নানা বিষয়ে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইত।

রাজা রামমোহন রায় রাজনৈতিক আন্দোলনেও যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল ইংরেজশাসনদ্বারা ভারতের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে; কিন্তু এই শাসন যাহাতে ন্যায় ও ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় তাহাই তাঁহার প্রার্থনীয় ছিল। এজন্য তিনি সময়ে সময়ে রাজপুরুষদিগকে যথোচিত সদুপদেশ প্রদান করিতেন। এতদ্ব্যতীত সংবাদকৌমুদী নামক বাঙ্গালা ভাষায় একখানা সংবাদপত্র প্রকাশ করিয়া দেশে রাজনৈতিক শিক্ষাপ্রচার করিয়াছিলেন। যে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতাপ্রদান ইংরেজ রাজত্বের একটী কীর্ত্তিস্তম্ভ, তাহাতেও রাজা রামমোহন রায়ের হাত ছিল এবং লর্ড মেটকাফের ন্যায় রাজা রামমোহনের নিকটও ভারতবর্ষ তজ্জন্য ঋণী।

বহুদিন হইতে রামমোহন রায় বিলাতগমনের সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু সুযোগ উপস্থিত না হওয়াতে এতদিন তাঁহার মনোগত ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। যাহা হউক ক্রমে অবস্থা অনুকূল হইয়া উঠিল। দিল্লীর বাদসাহের সহিত ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের কোনও জমিদারীর রাজস্ব নিয়া বিরোধ চলিতেছিল। অধস্তন বিচারালয়ে অকৃতকার্য্য হইয়া বাদসাহ স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট এক আবেদনপত্র প্রেরণের সঙ্কল্প করেন এবং রামমোহন রায়কে সনন্দদ্বারা রাজা উপাধি

প্রদান করিয়া তাঁহার উপর এই গুরুতর কার্য্যের ভার অর্পণ করিলেন। কিন্তু বিলাতগমনে রামমোহন রায়ের অন্যান্য উদ্দেশ্যও ছিল। তন্মধ্যে বিলাতের আচার ব্যবহার, ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক অবস্থা স্বচক্ষে দর্শন করিয়া জ্ঞানোপার্জ্জন একটী প্রধান।

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নবেম্বর তারিখে রাজা রামমোহন রায় তাঁহার পালিত পুত্র রাজারাম, রামরত্ন মুখোপাধ্যায় ও রাম-হরি দাসকে সঙ্গে লইয়া এলবিয়ন নামক জাহাজে বিলাত যাত্রা করিলেন। সম্ভ্রান্ত ভারতবাসীদের মধ্যে রাজা রামমোহনই বিলাতযাত্রার প্রথম পথপ্রদর্শক। যে সময়ে কলিকাতা হইতে কাশী যাইতে হইলে সমুদায় সম্পত্তি উইল করিতে হইত তখন-কার দিনে একজন বাঙ্গালীর পক্ষে সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া সুদূর বিলাত গমন যে কতদূর সাহস ও মহত্ত্বের পরিচায়ক তাহা সহজেই অনুমেয়।

১৮৩১ সালের ৮ই এপ্রিল তিনি লিভারপুলে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার ইংলণ্ড ভ্রমণের সংবাদ পাইয়া অনেক মহাত্মা তাঁহাকে দেখিবার জন্যই লিভারপুলে আসিয়াছিলেন। এই স্থানেই সুপ্রসিদ্ধ উইলিয়াম রস্কোর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। কিছুদিন লিভারপুলে থাকিয়া তিনি লণ্ডনে উপস্থিত হন এবং সেখানে এডেলফি হোটেলে আপন বাসস্থান নিরূপিত করেন। এই স্থানে প্রসিদ্ধ ব্যবস্থাদর্শনবিদ্ জেরেমি বেন্থাম এবং অন্যান্য অনেক বড়লোকের সহিত সাক্ষাৎ হয়। ইংলণ্ডাধিপতি চতুর্থ উইলিয়ামের রাজ্যাভিষেকের সময় অন্যান্য রাজদূতের সহিত

তাঁহার আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল এবং কিছুদিন পরে বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতি হব্‌হাউস সাহেব তাঁহাকে ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন। রামমোহন রায়ের সম্মানার্থ ইংলণ্ডে একটী সাধারণ সভা আহুত হইয়াছিল এবং উক্ত সভায় ইংলণ্ড এবং আমেরিকার বহু পণ্ডিত ব্যক্তি রামমোহন রায়ের প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। ১৮৩১ ও ১৮৩২ সালে কোম্পানীর নূতন সনন্দ গ্রহণোপলক্ষ্যে ভারতবর্ষের শাসন-প্রণালীর বিষয় অনুসন্ধান করিবার জন্য একটী কমিটি নিযুক্ত হয়। উক্ত কমিটী রাজা রামমোহন রায়ের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। উক্ত সাক্ষ্যপ্রদান কালে রাজা সিভিল সারভিস্, ভূমির বন্দোবস্ত, প্রজাগণের অবস্থার উন্নতি প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ে অনেক সংযত এবং সুচিন্তিত মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৩২ সালের শরৎকালে তিনি ফরাসী দেশ দর্শন করিতে যাত্রা করেন। তথায় সম্রাট লুই ফিলিপ তাঁহাকে সম্মানের সহিত গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত একত্র পান ভোজন করিয়াছিলেন। ১৮৩৩ সালের প্রারম্ভে ফরাসী দেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া রামমোহন লণ্ডন হইতে ব্রিষ্টলে গমন করেন। তথায় ষ্টেপল্‌টন গ্রোভ নামক মনোরম গৃহে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। ব্রিষ্টলে আসিবার কয়েক দিন পরেই উক্ত ষ্টেপল্‌টন গ্রোভ ভবনে একটা বৃহৎ সভারও অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত সভাতে ভারতবর্ষের ধর্ম্ম ও রাজনীতি সম্বন্ধীয় অবস্থা ও ভারতের ভবিষ্যৎ উন্নতি বিষয়ে অনেক আলোচনা হইয়াছিল। উপস্থিত সভ্যবৃন্দ রামমোহনের পাণ্ডিত্য ও তর্কশক্তি দেখিয়া

অবাক্ হইয়াছিলেন। কিন্তু হায় তখন কেহ জানিত না এই আলোচনাই তাঁহারই জীবনের শেষ আলোচনা। ১৯শে সেপ্টেম্বর তারিখে রাজা জ্বরাক্রান্ত হন। জ্বর ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কোন চিকিৎসাতেই রোগের উপশম হইল না। ১৮৩৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর জ্যোৎস্নাময়ী রজনীর শেষভাগে দুই ঘটিকা পঁচিশ মিনিটের সময় ৫৯ বৎসর বয়সে বর্ত্তমান ভারতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া অনন্ত-ধামে চলিয়া গেলেন।

রাজার ব্যারামের সময় তাঁহার ইংলণ্ডীয় বন্ধুগণ যথেষ্ট সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন এবং মৃত্যুর পর তাঁহারই আজ্ঞানু-সারে ষ্টেপল্‌টন গ্রোভের নিকটবর্ত্তী একটী নির্জ্জন বৃক্ষবাটিকায় ১৮ই অক্টোবর তারিখে নিঃশব্দে তাঁহার দেহ সমাধিস্থ হয়। ইহার কতিপয় বৎসর পরে রাজার পরম বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয় বিলাত গমন করিয়া উক্তস্থান হইতে মৃতদেহ Arno's Vale নামক স্থানে স্থানান্তরিত করিয়া তাহার উপর একটী সমাধি-মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। আজিও রাজার সেই সমাধি ভারতবাসীদের পরম পবিত্র তীর্থস্থান বলিয়া পূজিত হইয়া থাকে।

বিজ্ঞানের লক্ষণ।

আমরা বাল্যকালে শুনিয়াছি ইন্দ্রিয় জ্ঞানের দ্বার-স্বরূপ। কথাটা তখন ভাল করিয়া বুঝিতাম না। এখন বুঝি। ইন্দ্রিয় ৫টা—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্। এইসকল ইন্দ্রিয়-দ্বারাই আমরা বাহ্যজগতের জ্ঞান লাভ করি। চক্ষুদ্বারা দেখিতে পাই, কর্ণদ্বারা শুনিতে পাই, নাসিকা আমাদিগকে গন্ধ এবং জিহ্বা আমাদিগকে স্বাদ প্রদান করে, ত্বক্ আছে বলিয়াই আমরা বস্তুসকলের স্পর্শ লাভ করিতে পারি।

এইসকল ইন্দ্রিয়দ্বারা আমরা যে জ্ঞান লাভ করি তাহাকে ইন্দ্রিয়জ্ঞান বলে এবং প্রধানতঃ ইন্দ্রিয়জ্ঞানদ্বারাই আমরা বিভিন্ন বস্তুকে জানিতে এবং চিনিতে পারি। যখন বিশেষ এক প্রকার গন্ধ পাই তখন বলি এটা গোলাপের গন্ধ, এক প্রকার শব্দ শুনিতে পাইলে বলি এটা ঢাকের শব্দ। আমরা চক্ষুদ্বারা দেখিয়া বলি এটা গাছ, এটা ফল এবং হস্তদ্বারা স্পর্শ করিয়া বলি এ জিনিষটা শক্ত, এটা নরম। এই প্রকারে ইন্দ্রিয়সকলের ব্যবহারদ্বারা যাহা জানিতে এবং চিনিতে পারি তাহাকে বস্তু বা পদার্থ বলে।

যখন কোন ইন্দ্রিয়দ্বারা কোন বস্তুসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করি তখন বলি যে ঐ বস্তুই ঐপ্রকার জ্ঞানের কারণ এবং আমাদের জ্ঞান ঐ কারণ হইতে উৎপন্ন একটী কার্য্য মাত্র। গোলাপ ফুল হইতে যখন সুন্দর এক প্রকার গন্ধের অনুভূতি হয় তখন বলি গন্ধানুভূতি একটী কার্য্য এবং গোলাপ ফুলই উহার কারণ

অর্থাৎ গোলাপ আছে বলিয়াই গন্ধ পাইতেছি, গোলাপ ফুল না থাকিলে ঐ গন্ধ পাইতাম না। এই প্রকার যখন ঘরে বসিয়া কোন শব্দ শুনিতে পাই তখন মনে ভাবি কে এই শব্দ উৎপন্ন করিল অর্থাৎ এই শব্দোৎপাদনের কারণ কি? তারপর যখন বাহিরে যাইয়া দেখি একটা বিড়াল নড়িতেছে তখন মনে করি যে বিড়ালই ঐ শব্দের কারণ।

যতক্ষণ এই কারণটী জানা না যায় ততক্ষণ মনে শান্তি পাই না। মনে করি বিষয়টী প্রকৃতপক্ষে জানা হইল না এবং আমাদের জ্ঞান অপূর্ণ রহিয়া গেল। ঘরে বসিয়া যদি একটা গন্ধ অনুভব করিলাম অথচ জানিতে পারিলাম না উহা কিসের গন্ধ, কোথা হইতে আসিল, তাহা হইলে আমরা কিছুতেই নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না, ঘরের চারিদিকে খুজিয়া দেখি কিসের গন্ধ এবং যতক্ষণ কারণটী আবিষ্কার করিতে না পারি ততক্ষণ প্রাণটা যেন ছট্‌ফট্‌ করিতে থাকে। এই প্রকার আমরা আভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক প্রত্যেক ব্যাপারেরই কারণ অনুসন্ধান করিয়া থাকি, কেন এটা হইল তাহা জানিতে ব্যাকুল হই এবং কারণটী স্থিরীকৃত হইলে অথবা কেন এরূপ হইল এই প্রশ্নের উত্তর পাইলেই বিষয়টীর মীমাংসা হইল বলিয়া মনে করি।

কিন্তু কোন একটি কার্য্যের কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারিলেই যে চূড়ান্ত মীমাংসা হইল তাহা নহে। ঐ কারণের কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্য তখন ব্যাকুল হইয়া পড়ি। কাযেই কেন এই প্রশ্ন সর্ব্বদাই আমাদের মনে উঠিয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে কোন বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসা জগতে আছে কি না সন্দেহ।

মনে করুন কোন স্থানে কতকগুলি খড় জ্বলিতেছে। খড়-গুলিকে জ্বলিতে দেখিয়া মনে এই প্রশ্ন উদিত হয়, কোথা হইতে এই আগুন আসিল। অনুসন্ধানে জানিলে পারিলাম যে একটী জ্বলন্ত দিয়াশলাই নিক্ষিপ্ত হওয়াতে খড়ে আগুন ধরিয়াছে। এখানে আগুন জ্বলিবার কারণ নির্দ্দিষ্ট হইল বটে, কিন্তু দিয়াশলাইত আপনাহইতে তথায় আসে নাই, কে ঐ দিয়াশলাইটী নিক্ষেপ্ করিল এবং কেনই বা নিক্ষেপ করিল, এই প্রশ্নটি স্বতঃই মনে উদিত হয়। তারপর যদি নিক্ষেপকারী ব্যক্তির পরিচয় বা উদ্দেশ্য জানা যায় তবে নিক্ষেপের কারণ বুঝিতে পারি সত্য, কিন্তু তার পরেই প্রশ্ন হইবে, উক্ত ব্যক্তির ঐরূপ উদ্দেশ্য হওয়ার কারণ কি? এইরূপ একটি বিষয়ের মীমাংসা হইলেই অপর একটি বিষয় উপস্থিত হইবে, যেহেতু আমরা বিশ্বাস করি যে প্রত্যেক কার্য্যেরই কোন না কোন কারণ আছে, অর্থাৎ কারণ ব্যতীত কোন কার্য্যই ঘটিতে পারে না। 'ক' এর কারণ 'খ', 'খ'এর কারণ 'গ', 'গ'এর কারণ 'ঘ', 'ঘ'এর কারণ 'চ'—এইরূপে সমস্ত জগৎ একটা কার্য্যকারণের শৃঙ্খলে আবদ্ধ।

কোন বস্তু হইতে সর্ব্বদাই যদি কোন বিশেষ কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে ঐ প্রকার কার্য্যকে উহার ধর্ম্ম বা শক্তি বলে। গোলাপ হইতে সর্ব্বদাই এক প্রকার গন্ধের উৎপত্তি হয় যাহা অন্য বস্তুতে নাই। কাজেই ঐপ্রকার বিশেষ গন্ধকে গোলাপের শক্তি বা ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে। এইরূপ সীসাকে হাতে লইলে উহা সর্ব্বদাই ভারী বলিয়া বোধ হয়, অতএব গুরুত্ব সীসার একটী ধর্ম্ম বা শক্তি। বিষধর সর্পে

আঘাত করিলে প্রাণ বিনষ্ট হয়, অতএব প্রাণনাশের ক্ষমতা বিষধর সর্পের ধর্ম্ম বা শক্তি।

কোন বস্তুকে ভাল করিয়া জানিতে হইলে উহার ধর্ম্ম বা শক্তিসম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ আবশ্যক। কারণ, বস্তুর শক্তি বা ধর্ম্ম না জানিলে উহা দ্বারা কি কি কার্য্য উৎপন্ন হয় তাহাও জানিতে পারা যায় না।

আমরা ইন্দ্রিয়দ্বারা যে সকল বস্তুর জ্ঞান লাভ করি তন্মধ্যে কতকগুলি মানুষকর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে, যেমন ঘর, বাড়ী, দুয়ার ইত্যাদি। এইসকল জিনিষ প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না, মানুষ আপনার বুদ্ধিকৌশলে এবং পরিশ্রমের দ্বারা উহাদিগকে প্রস্তুত করিয়াছে। আবার কতকগুলি বস্তু প্রকৃতিজাত, উহারা প্রকৃতিতেই পাওয়া যায়। যেমন চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশ প্রভৃতি। উহাদিগকে মানুষে তৈয়ার করে নাই এবং উহারা মনুষ্যসৃষ্টির বহু পূর্ব্বহইতে বিদ্যমান আছে।

কিন্তু যেসকল বস্তু মানুষে তৈয়ার করিয়াছে তাহাদেরও উপাদান প্রকৃতিদত্ত। প্রকৃতিহইতে নানা উপাদান সংগ্রহ করিয়া মানুষ আপনার বুদ্ধিবল ও পরিশ্রমদ্বারা নানাবিধ জিনিষ প্রস্তুত করিয়াছে। একখানা বাড়ী প্রস্তুত করিতে হইলে ইট, কাঠ, লোহা প্রভৃতির দরকার। মাটী হইতে ইট হয়, কিন্তু মাটীত মানুষে তৈয়ার করে নাই, উহা প্রকৃতিতেই আছে। এইরূপ গাছ হইতে কাঠ তৈয়ারী হইয়াছে এবং খনি হইতে লোহা তুলিয়া নানাবিধ লৌহনির্ম্মিত জিনিষ প্রস্তুত করা হইয়াছে। কাযেই একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, মানুষের

তৈয়ারী প্রত্যেক জিনিষেরই মূল উপাদান প্রকৃতিহইতে প্রাপ্ত।

এইক্ষণে এইসকল উপাদানহইতে কোনও জিনিষ প্রস্তুত করিতে হইলে উহাদের শক্তি বা ধর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা দরকার। গাছের সারভাগ শক্ত, বহুদিন স্থায়ী হয় অথচ সহজে উহাকে কাটিয়া নানা অংশে বিভক্ত ও নানা আকৃতিতে পরিবর্ত্তন করা যায়, এই সকল কথা না জানিলে আমরা কখনও বৃক্ষহইতে কাঠ কাটিয়া তদ্দ্বারা দরজা, জানালা, চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে পারিতাম না। সূতার, মিস্ত্রী, কর্ম্মকার প্রভৃতি শিল্পীগণ সকলেই প্রাকৃতিক অনেক পদার্থের শক্তি, ধর্ম্ম ও কার্য্য সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করে, নচেৎ তাহারা কিছুতেই প্রাকৃতিক উপাদানসমূহের সম্মিলনে আপনাদের উপযোগী নানাবিধ জিনিষ প্রস্তুত করিতে পারিত না। প্রাকৃতিক বস্তুসমূহের শক্তি এবং জগৎব্যাপী কার্য্যকারণ-শৃঙ্খল সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যতই বৃদ্ধি পাইবে ততই প্রাকৃতিক উপাদান সকলের উপযুক্ত ব্যবহারদ্বারা আমাদের সুখ এবং সুবিধা বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইব।

কিন্তু একথা মনে রাখিতে হইবে প্রকৃতির উপর আমাদের আধিপত্যের একটা সীমা আছে। এমন অনেক ব্যাপার আছে যাহাদের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অতি অসম্পূর্ণ এবং যাহাদের উপর আমাদের আধিপত্য মোটেই নাই। আকাশে সূর্য্য উদিত হয় এবং অস্ত যায়; চন্দ্র এবং গ্রহ-মণ্ডলী বহুদূরে আপন গতিতে ভ্রমণ করিয়া থাকে; বাত্যা, বন্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক

উপদ্রবসকল সুন্দর রমণীয় শস্যশ্যামল ভূমি-খণ্ডকে শ্মশানে পরিণত করে। এইসকল প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়মিত করিবার সাধ্য আমাদের নাই। যতদিন মানুষের জ্ঞান অসম্পূর্ণ এবং শক্তি সীমাবদ্ধ থাকিবে ততদিন এইসকল মহাশক্তির অধীন হইয়াই আমাদিগকে চলিতে হইবে।

বিশ্বজগতের অনেকাংশ আমাদের জ্ঞান এবং অধিকারের বাহিরে থাকিলেও প্রাকৃতিক অনুসন্ধানের প্রথম সোপানেই আমরা জানিতে পারি যে প্রকৃতির সর্ব্বত্রই একটা নিয়ম এবং শৃঙ্খলা বিরাজমান। প্রাকৃতিক ঘটনাবলী সর্ব্বত্রই নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা, কোথাও কোন ব্যতিক্রম হওয়ার যো নাই। কোনও কারণ উপস্থিত হইলে তাহার পরবর্ত্তী কার্য্য অবশ্যই ঘটিবে এবং একই কারণ হইতে সর্ব্বত্র একই কার্য্যের উৎপত্তি হইবে। সূর্য্যদেব প্রত্যূষে পূর্ব্বদিকেই উদিত হইবে এবং সন্ধ্যাকালে পশ্চিমদিকেই অস্ত যাইবে, চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি একটা সুনির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীনে সর্ব্বত্র একভাবেই ঘটিবে, জল সর্ব্বত্রই নিম্নগামী হইবে এবং অগ্নির দাহিকাশক্তির কখনও ব্যতিক্রম ঘটিবে না। আম্রের বীজ হইতে আম্রবৃক্ষই উৎপন্ন হইবে, কখনও কাঁঠাল গাছ জন্মিবে না।

প্রকৃতপক্ষে বিশ্বজগতে আকস্মিক ঘটনা বলিয়া কোনও জিনিষ নাই। সমস্তই এক অলঙ্ঘনীয় নিয়মাধীনে কার্য্যকারণ-সূত্রে গ্রথিত হইয়া আছে। কোন কার্য্যই বিনা কারণে ঘটে না এবং কারণ উপস্থিত হইলে, অথচ কোন প্রতিবন্ধক না থাকিলে, তাহার কার্য্য ঘটিবেই ঘটিবে। কোন কোন স্থলে আপাতদৃষ্টিতে

এই নিয়মের ব্যতিক্রম লক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহারা ব্যতিক্রম নহে। অজ্ঞতাবশতঃ আমরা মনে করি, যেন প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম হইল। মনে করুন, সমস্ত আকাশ নিস্তব্ধ, কেহ আশা করে নাই যে এসময় ঝড় আসিবে। কিন্তু অত্যল্প সময়ের মধ্যে আকাশে ঘনঘটা করিয়া ঝড় আসিল এবং হঠাৎ গাছের একটা ডাল ভাঙ্গিয়া নিম্নস্থ কোন ব্যক্তির মস্তকে আঘাত করিল। এস্থলে স্থূলবুদ্ধি মনে করিতে পারে যে এই ঝড় একটা আকস্মিক ঘটনা, যেন উহা বিনা কারণেই উদ্ভূত হইয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ঝড়ের কারণ হয়ত বহুদূরে এবং অনেক পূর্ব্বহইতেই সঞ্চিত হইতেছিল, আমরা তাহার কিছুই জানি না, এবং ঐ সকল কারণের সমবায়েই কার্য্যের (ঝড়) উৎপত্তি হইল। আমরা অজ্ঞতাবশতঃ মনে করিলাম যেন একটা আকস্মিক ঘটনা ঘটিয়া গেল। এইরূপ গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া ব্যক্তি-বিশেষের মস্তকে আঘাত করাও আকস্মিক ঘটনা বলিয়া অনুমিত হইতে পারে; কিন্তু একটু অনুধাবন করিলেই দেখা যাইবে যে সে ব্যক্তি কোন উদ্দেশ্যের বশীভূত হইয়াই বৃক্ষমূলে গিয়াছিল এবং বৃক্ষের ডালও প্রাকৃতিক নিয়মানুবলেই ভাঙ্গিয়া তাহাকে আঘাত করিয়াছিল। কিন্তু অনেক স্থলে ঘটনাসমূহের জটিলতা অথবা স্বীয় অজ্ঞতা নিবন্ধন আমরা কার্য্যকারণসূত্র খুজিয়া পাই না, তাই ঐপ্রকারের ঘটনাগুলিকে আকস্মিক বলিয়া মনে করি।

আমাদের দেশের অদৃষ্টবাদও অনেকটা এই প্রাকৃতিক নিয়মের অজ্ঞতা হইতে উৎপন্ন। আমরা যেখানে কোনও

কার্য্যের প্রকৃত কারণ নির্ণয় করিতে না পারি, সেখানেই বলিয়া থাকি যে উহা অদৃষ্ট বা দৈব বশতঃ ঘটিয়াছে। এই প্রকার দৈবে বিশ্বাস মানসিক জড়তার পরিচায়ক। অনুসন্ধান এবং পরীক্ষা দ্বারা জটিল বিষয়সমূহের মীমাংসা করিতে চিন্তাশীলতা এবং পরিশ্রমের দরকার। যাহারা চিন্তা করিতে অথবা অনুসন্ধান ও যুক্তিবলে কতকগুলি জ্ঞাত-পূর্ব্ব সত্য হইতে কোন স্থিরসিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারে, অথবা তজ্জন্য শ্রম স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক তাহারাই অনেক বিষয় দৈবের ঘাড়ে চাপাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে।

প্রাকৃতিক নিয়মগুলি অনেক সময় আপনাহইতে ধরা দেয় না; উহাদিগকে খুজিয়া বাহির করিতে হয়। এজন্য তীক্ষ্ণ পর্য্যবেক্ষণ ও প্রভূত অনুসন্ধানের দরকার। এই পর্য্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের ফলে যখন দেখিতে পাই যে কোন ঘটনা সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে একই ভাবে ঘটিতেছে, কোথাও তাহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না, তখনই আমরা মনে করি যে উহা একটি নিয়মাধীনে ঘটিতেছে। আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই যে বস্তুসকল আশ্রয় না পাইলে ভূমিতে পড়িয়া যায়, জল সর্ব্বদাই নিম্নদিকে প্রবাহিত হয়, কোন বস্তুতে আগুন ধরাইলে তাহা পুড়িয়া যায়। কোন প্রতিরোধী কারণ না থাকিলে এই সকল ব্যাপারের কোনও ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। কাযেই আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে উপরোক্ত ব্যাপারগুলি প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই ঘটিতেছে।

এস্থলে একথা মনে রাখিতে হইবে যে জাগতিক ঘটনা সকল প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ঘটে সত্য, কিন্তু নিয়মগুলি ঐ সকল

ঘটনার কারণ নহে। বস্তুসকলের নিম্নপতনের কারণ মাধ্যাকর্ষণ, আগুণে পুড়িয়া যাইবার কারণ উহার দাহিকাশক্তি। ঐ কারণগুলি সর্ব্বদা সকল স্থানে একই কার্য্যের উৎপাদন করে এইমাত্র। কাজেই কার্য্যকারণের এই একরূপতানিবন্ধন কারণটি ঘটিলেই আমরা বলিতে পারি ইহার পর কোন্ কার্য্যটি ঘটিবে এবং কার্য্যটি ঘটিলে বলিতে পারি কোন্ কারণ বশতঃ উহা ঘটিল।

এক্ষণ রাজনিয়মের সহিত প্রাকৃতিক নিয়মের তুলনা করিলে এ বিষয়টি আরও পরিষ্কার হইবে। প্রজাবর্গের শাসনের জন্য রাজা কতকগুলি নিয়ম প্রচার করেন, উহাদের সাধারণ নাম আইন। যদি কেহ ঐ নিয়ম ভঙ্গ করে তবে তাহাকে শাস্তি পাইতে হয়। এক্ষণে রাজার আইন সকলের পক্ষে সমান হইবে। যদি আইন এরূপ হয় যে, তাহা একব্যক্তির পক্ষে খাটে অন্য ব্যক্তির পক্ষে খাটে না, তবে তাহাকে আইন বলা যাইতে পারে না। প্রাকৃতিক নিয়মের মধ্যে কোন আদেশ ও তদ্‌ভঙ্গজনিত শাস্তির ভাব নাই সত্য, কিন্তু সর্ব্বত্র একরূপতার ভাব উভয় স্থলেই বিদ্যমান আছে। দেশের আইনকানুন যেমন সর্ব্বত্র সকল লোকের প্রতি একভাবেই প্রযোজ্য, তদ্রূপ প্রাকৃতিক নিয়মসকলও সর্ব্বত্র সমভাবাপন্ন। তারপর দেশের আইন যেরূপ লোকের সচ্চরিত্রতার কারণ নহে, তদ্রূপ প্রাকৃতিক নিয়মসমূহও প্রকৃতিক ব্যাপারের কারণ নহে।

দেশের আইন না জানিলে তথায় বাস করা যেরূপ কঠিন, প্রাকৃতিক নিয়ম না জানিলেও আমাদের সংসারে থাকা কঠিন

ব্যাপার। বিষ ভক্ষণ করিলে যে মৃত্যু হয়, তাহা যদি না জানি তবে যে কোন সময় বিপদ ঘটিতে পারে, আগুনে পড়িলে পুড়িয়া যাইতে হয় তাহাও জানা দরকার, নচেৎ কোন্ সময় পুড়িয়া মরি তাহার নিশ্চয়তা নাই। বস্তুসকল উপরহইতে ভূমিতে পড়ে, শৈত্যাধিক্য হইলে জল জমিয়া বরফ হয় ইত্যাদি প্রাকৃতিক নিয়মগুলির জ্ঞান আমাদের প্রাত্যহিক কাজে সর্ব্বদা দরকার হইয়া থাকে। স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম না জানিলে সর্ব্বদা রোগ ভোগ করিতে হয়। এরূপভাবে যেদিকেই দৃষ্টিপাত করা যায়, দেখা যাইবে যে স্বচ্ছন্দে ও নিরাপদে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইলে প্রাকৃতিক নিয়মসমূহের জ্ঞান লাভ একান্ত প্রয়োজনীয়।

তাহার পর যাহারা এ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন তাহাদেরই সুখ এবং সমৃদ্ধি সর্ব্বপ্রকারে বৃদ্ধি পাইয়াছে। রেলগাড়ী, জাহাজ, তড়িতালোক প্রভৃতি আবিষ্কার বিজ্ঞান-চর্চ্চারই ফল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রাকৃতিক নিয়মাবলীর আবিষ্কারে এত যত্ন এবং পরিশ্রম করেন বলিয়াই সাংসারিক হিসাবে তাঁহাদের এত উন্নতি। আর বিজ্ঞানচর্চ্চায় নিতান্ত উদাসীন বলিয়াই আমরা সভ্যজগতের এত পশ্চাতে রহিয়াছি।

এইক্ষণ প্রশ্ন হইতে পারে কি উপায়ে প্রাকৃতিক নিয়ম সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করা যায়। অবশ্য স্বীকার করিতেই হইবে প্রকৃতিসম্বন্ধে কোনও জ্ঞান লাভ করিতে হইলে পর্য্য-বেক্ষণ ও পরীক্ষাই আমাদের প্রধান অবলম্বন। এই পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি সকলের সমান থাকে না। কেহ কেহ বাল্যকালহইতেই

তীক্ষ্ণপর্য্যবেক্ষণশীল। যাহাদের পর্য্যবেক্ষণশক্তি খুব তীক্ষ্ণ তাহারাই নানা বিষয়ে সম্যক্‌জ্ঞান লাভ করে। এই পর্য্যবেক্ষণই জ্ঞানলাভের প্রথম সোপান। কিন্তু এজন্য শিক্ষা ও অনুশীলনের দরকার। কেবল প্রকৃতিদত্ত শক্তি থাকিলেই চলিবে না, উপযুক্ত অনুশীলনদ্বারা উহাকে কার্য্যোপযোগী করিতে হইবে এবং উহার পরিসর বৃদ্ধি করিতে হইবে। চক্ষু, কর্ণ, ত্বক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ত সকলেরই আছে কিন্তু কয়জনে উহাদের উপযুক্ত ব্যবহার করিতে জানে? সেজন্যই বলিতেছিলাম ইন্দ্রিয়সমূহের শিক্ষা এবং অনুশীলনের দরকার। তারপর কেবল দেখিয়া বা শুনিয়া গেলেই পর্য্যবেক্ষণ হয় না। রাস্তা দিয়া চলিয়া যাইতে কত জিনিষ আমাদের চক্ষে পড়ে, কিন্তু সে প্রকার দেখা পর্য্যবেক্ষণ নহে। পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইলে মনঃসংযোগ চাই। সমাহিতচিত্তে যখন কোন বিষয় দেখি বা শুনি অথবা অন্য কোন ইন্দ্রিয়দ্বারা তাহা উপলব্ধি করি তখনই পর্য্যবেক্ষণ হইল, বলা যাইতে পারে।

তারপর কেবল মনঃসংযোগেই পর্য্যবেক্ষণ হয় না, পর্য্যবেক্ষণের মধ্যে একটা উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। উদ্দেশ্যবিহীন নিরর্থক দেখাশোনাকে পর্য্যবেক্ষণ বলা যায় না।

যে বিষয়টী পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে তাহা কখনও কখনও আমাদের সম্মুখে আপনাহইতেই উপস্থিত হয় কখনও বা সেই জিনিষটীকে পর্য্যবেক্ষকের নিজেই প্রস্তুত বা উৎপন্ন করিয়া লইতে হয়। গাছে ফুল ফুটিয়া থাকে, বৃষ্টির সময় আকাশ হইতে জল পড়ে, প্রভাতে সূর্য্য উদিত হয়—এই সকল ঘটনা প্রকৃতি

আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া থাকে, আমরা কেবল উহা-দিগকে পর্য্যবেক্ষণ করি মাত্র। পক্ষান্তরে জল জমাইয়া আমরা বরফ প্রস্তুত করি, তাপ লাগাইয়া জলকে বাষ্পে পরিণত করি —এগুলি পরীক্ষা। গাছ হইতে ফলটাকে যদি মাটিতে পড়িতে দেখি তবে তাহা পর্য্যবেক্ষণ, আর গাছ হইতে যদি নিজে ফেলিয়া দিয়া দেখি, তবে তাহা পরীক্ষা। পরীক্ষার মধ্যেও পর্য্যবেক্ষণ আছে, তবে প্রভেদ এই যে পর্য্যবেক্ষণ পর্য্যবেক্ষকের নিজের কোন কার্য্য করিতে হয় না, পরীক্ষাতে তাহাকে নিজে কিছু কাজ করিতে হয়।

পর্য্যবেক্ষণ বা পরীক্ষা দ্বারা আমরা কেবল ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে বর্ত্তমান বস্তুসকলের জ্ঞানলাভ করিতে পারি। যাহা আমাদের ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে উপস্থিত নাই, ইন্দ্রিয়দ্বারা যাহা আমরা ধরিতে পারি না, অথবা যাহা ভবিষ্যতে ঘটিবে এপ্রকার বিষয়ের জ্ঞান লাভ কখনও পর্য্যবেক্ষণ বা পরীক্ষা দ্বারা হইতে পারে না। আজ প্রাতে পূর্ব্বদিকে সূর্য্য উদিত হইল তাহা স্বচক্ষে দেখিলাম, গতকল্য উদিত হইয়াছিল তাহাও দেখিয়াছি, এস্থলে সূর্য্যোদয়ের জ্ঞান পর্য্যবেক্ষণলব্ধ। কিন্তু আগামী কল্য যে সূর্য্য উঠিবে তাহাত প্রত্যক্ষ নহে, তাহাত এখনও কোনও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ী-ভূত হয় নাই, তবে কিপ্রকারে জানিলাম যে কাল সূর্য্য উদিত হইবে। এজ্ঞান কখনও পর্য্যবেক্ষণদ্বারা লাভ করিতে পারা যায় না। এখানে অনুমান বা যুক্তিই আমাদের সম্বল। যাহা ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষীভূত নহে তাহা জানিতে হইলে অনুমানব্যতীত উপায়ান্তর নাই। এক্ষণ দেখা যাক আমরা কি প্রকারে অনুমান-

দ্বারা নূতন জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি। মনে করুন আমরা বহুদিন সূর্য্যকে পূর্ব্বদিকে উদিত হইতে দেখিয়াছি, আজও তাহাই দেখিতেছি, কালও তাহাই দেখিয়াছি। তারপর অন্য সকলের নিকটও শুনিয়াছি যে তাহারা চিরকাল সূর্য্যকে পূর্ব্বদিকেই উদিত হইতে দেখিয়াছে। কেহই তাহার ব্যতিক্রম কখনও দেখে নাই। সুতরাং আমরা অনুমান করি যে যেহেতু সূর্য্য বরাবরই পূর্ব্বদিকে উঠিয়াছে, কখনও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই, অতএব আগামী কল্যও সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উঠিবে। "পর্ব্বতো-বহ্নিমান্ ধূমাৎ" পর্ব্বতের ভিতর আগুণ আছে, কারণ বাহিরে ধূম দেখা যাইতেছে। এ স্থলে ধূমই আমরা দেখিতে পাইতেছি, অগ্নি দেখিতে পাই না। ধূমের অস্তিত্ব হইতে অগ্নির অস্তিত্ব অনুমান করি। কারণ পূর্ব্বে যেখানে যেখানে ধূম দেখা গিয়াছে, তথায় অগ্নিও দেখা গিয়াছে, কোথাও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই, এস্থলেও ধূম দেখা যাইতেছে, কাযেই অনুমান হয় এখানেও অগ্নি আছে।

এ কথা সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে অনুমানদ্বারা যে জ্ঞান লাভ করি তাহাও ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। কারণ, পূর্ব্বে কিছু জানা না থাকিলে আমরা কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি না। জ্ঞাতপূর্ব্ব বিষয় বা অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করিয়া অনুমানসাহায্যে নূতন সত্যে উপনীত হইতে হয়। উপরের লিখিত উদাহরণ দুইটার আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে সূর্য্য যে পূর্ব্বদিকে উঠিয়াছে তাহা আমার জানা ছিল, কারণ আমি তাহা দেখিয়াছি। এই জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া

অনুমানবলে জানিতে পারিলাম কাল সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উঠিবে। সূর্য্যকে যদি কখনও পূর্ব্বদিকে উঠিতে না দেখিতাম তবে কখনও বলিতে পারিতাম না যে কাল সূর্য্য পূর্ব্বদিকে উঠিবে। এইরূপ ধূমের সহিত অগ্নির সমাবেশ অনেকবার লক্ষ্য করিয়াছি, কাযেই ধূম দেখিলে সিদ্ধান্ত করি যে এখানে অগ্নিও আছে।

ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অসুবিধা এই যে তদ্দারা আমরা সাধারণ সত্যে উপনীত হইতে পারি না। আমরা চক্ষুদ্বারা এক সময়ে একটী, দশটী কি ততোধিক কোন নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক বস্তুর জ্ঞান লাভ করিতে পারি। এইরূপ শ্রবণ, স্পর্শন প্রভৃতি দ্বারাও এক সময়ে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক বস্তুর জ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু, যাহা সাধারণ সত্য, যাহা সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে প্রযোজ্য, যাহার নির্দ্দিষ্ট কোন সীমা বা সংখ্যা নাই এরূপ বিষয়ের জ্ঞান কখনও ইন্দ্রিয়দ্বারা লাভ করা যায় না। যেমন "রাম মরিয়াছে" "শ্যাম মরিয়াছে" প্রভৃতি ঘটনা আমরা প্রত্যক্ষ করিতে পারি, কিন্তু "মানুষ মরণশীল" ইহাত কেবল ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারদ্বারা জানিতে পারি না। কারণ "মানুষ মরণশীল" ইহাতে বুঝায় পূর্ব্বে যেখানে যত মানুষ জন্মিয়াছে সকলই মরিয়াছে, বর্ত্তমানে যত মানুষ জীবিত আছে এবং ভবিষ্যতে যেখানে যত মানুষ জন্মিবে সকলেই মরিবে। এক্ষণে এপ্রকার সাধারণ সত্য কখনও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত হইতে পারে না। ভবিষ্যতে লোক মরিবে, সহস্র বৎসর পূর্ব্বেও লোক মরিয়াছিল, তাহা বর্ত্তমানে কখনও কেহ ইন্দ্রিয়দ্বারা জানিতে পারে না, কাযেই এইসকল সাধারণ সত্য কেবল অনুমানদ্বারাই জ্ঞাতব্য।

আমরা পূর্ব্বে যে প্রাকৃতিক নিয়মসমূহের আলোচনা করিয়াছি সেগুলি সমস্তই সাধারণ সত্য। একই অবস্থায় সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে তাহারা প্রযোজ্য। "আগুনে পোড়ে" "জল সর্ব্বদা নিম্নগামী" "আশ্রয় না পাইলে বস্তু সকল ভূমিতে পড়ে" —এসকল প্রাকৃতিক নিয়ম সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালেই একরূপ, এখন যে প্রকার ঘটিতেছে সহস্র বৎসর পরেও সেপ্রকারই ঘটিবে। কাযেই উহারা সাধারণ সত্য। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি কিপ্রকারে প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া অনুমানদ্বারা সাধারণ সত্যে উপনীত হওয়া যায়।

ইহাও বলিয়াছি যে সাধারণ সত্যসমূহ কখন ইন্দ্রিয়-জ্ঞান-দ্বারা লাভ করা যায় না। কাজেই স্বীকার করিতে হইবে যে প্রাকৃতিক নিয়মসমূহও আমরা কেবল অনুমানবলেই জানিতে পারি।

এই প্রাকৃতিক নিয়মগুলিই বিজ্ঞানের ভিত্তিভূমি। যখন প্রাকৃতিক কোনও বিষয়ে কতকগুলি সাধারণ সত্য আবিষ্কৃত হইয়া সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত হয় তখনই তাহাকে বিজ্ঞান বলে।

এক্ষণ বিজ্ঞানের লক্ষণগুলির আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, প্রথমতঃ বৈজ্ঞানিক সত্যগুলি সাধারণ সত্য। কোন বিশেষ ঘটনার জ্ঞানকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বলা যাইতে পারে না। জলের উপর এক খণ্ড বা বহু খণ্ড সোলা ভাসিতে দেখিলাম, ইহাকে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বলা যাইতে পারে না, কারণ ইহা সাধারণ সত্য নহে, একটি বিশেষ ঘটনা মাত্র। কিন্তু যদি বলি "সোলামাত্রই জলে ভাসে" অথবা "লঘু পদার্থমাত্রই জলে ভাসে" তাহা হইলে

বৈজ্ঞানিক সত্য হইল। কারণ সোলামাত্রই জলে ভাসে ইহা কেবল সোলাবিশেষের প্রতি প্রযোজ্য নহে। সর্ব্বদেশে সর্ব্বকালে সকল সোলারই ধর্ম্ম এই। তারপর কোন বিষয়ে একটি মাত্র প্রাকৃতিক নিয়ম জ্ঞাত হইলেই তাহা বিজ্ঞান হইল না। বিজ্ঞান বলিতে একই বিষয়ে কতকগুলি পরস্পর সম্বন্ধ ও সুশৃঙ্খল ভাবে বিন্যস্ত সাধারণ সত্যের সমষ্টি বুঝায়। সোলা জলে ভাসে একথা বলিলেই একটী বিজ্ঞান হইল না। সোলা কেন জলে ভাসে—কাযেই সোলার ধর্ম্মের সহিত জলের ধর্ম্মের কি সম্বন্ধ, এবং জলের সঙ্গে অন্যান্য পদার্থের সহিত এবিষয়ে সাদৃশ্য আছে কি না, এসকল বিষয়ের আলোচনাদ্বারা যদি কতকগুলি পরস্পারসম্বদ্ধ প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কৃত হয় তবে তাহার সমষ্টিই বিজ্ঞান আখ্যা পাইবে। তারপর আলোচনা ও গবেষণার সুবিধার জন্য প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহকে কতকগুলি বিভাগে বিভক্ত করা হয় এবং প্রত্যেক বিভাগের নিয়মসমূহের সমষ্টি এক একটী বিজ্ঞান নামে অভিহিত হয়। যে শাস্ত্রে গ্রহ উপগ্রহের গতিবিধির নিয়মসমূহ আলোচিত হয় তাহার নাম জ্যোতি-বিজ্ঞান, যে শাস্ত্রে বস্তুসমূহের আণবিক গঠন, সংযোগ বিয়োগ ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা হয় তাহাকে রসায়ন বলে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বৈজ্ঞানিক আলোচনার উদ্দেশ্য কতকগুলি প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতিষ্ঠা। কিপ্রকারে এসকল প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতিষ্ঠা হয় তাহাও বলিয়াছি। পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষালব্ধ ঘটনাবলীকে ভিত্তিভূমি করিয়া অনুমানদ্বারা আমরা এই সকল নিয়মে উপনীত হই। তারপর নিয়মগুলির মধ্যে

পরস্পর সম্বন্ধ ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হইলেই তাহা বিজ্ঞান আখ্যা পায়।

বিজ্ঞানের আর একটি বিশেষত্ব এই যে ইহাতে কোন বিষয়ই স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইবে না। প্রত্যেক ঘটনার যথাসম্ভব কারণ নির্দ্দেশ করিতে হইবে। যেখানে কোন কারণ নির্দ্দেশ করা গেল না সেখানে বিজ্ঞান অপূর্ণ রহিয়া গেল। তারপর কোনও প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কৃত হইলে অথবা কোনও সাধারণ সত্য যুক্তিবলে প্রতিষ্ঠিত হইলে অপরাপর জ্ঞাতপূর্ব্ব নিয়ম বা সিদ্ধান্তের সহিত উহার সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে হইবে। যতক্ষণ এই সম্বন্ধ স্থাপিত না হইবে ততক্ষণ উহা বৈজ্ঞানিক সত্যের সহিত একাসনে স্থান পাওয়ার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

হানিবলের ইটালী-জয়।

উপরে যে মহাত্মার নাম লিখিত হইল সকল দিক বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাহার মত বীর পুরুষ প্রাচীন জগতে আর জন্মগ্রহণ করিয়াছে কি না সন্দেহ। এমন স্বদেশ-প্রেম, এমন আত্মনির্ভর, এমন রণকৌশল সচরাচর দৃষ্ট হয় না। যখনি হানিবলের কথা মনে হয় তখনি এক অসাধারণ বীর-পুরুষের মূর্ত্তি আমার হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। সে মূর্ত্তির তুলনা আমি সমস্ত ইতিহাস খুজিয়াও বেশী পাই নাই, ভবিষ্যতেও পাওয়া যাইবে কিনা বলিতে পারি না।

বর্ত্তমান মিসর দেশের উত্তরপশ্চিম কোণে যেখানে টিউনিস নগর অবস্থিত তাহারি সন্নিকটে প্রাচীনকালে কার্থেজনামে একটি সমৃদ্ধিশালী নগরী বর্ত্তমান ছিল। উহার ধ্বংসাবশেষ এখনও দৃষ্ট হয়। ৮২৫ খৃঃ পূঃ অব্দে টায়র নগরবাসী ফিনিসিয়ানগণকর্ত্তৃক এই নগরের প্রতিষ্ঠা হয়। ফিনিসিয়ানগণ পূর্ব্বকালে বাণিজ্যব্যবসায়ে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল এবং কার্থেজও একটি বৃহৎ বাণিজ্যস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।

এই কার্থেজে যে সকল ফিনিসিয়ান বাস করিত তাহাদের অনেকেই বাণিজ্যব্যবসায়দ্বারা প্রভূত ধনসঞ্চয় করিয়াছিল এবং অজস্র ধনের সাহায্যে বিদেশ হইতে সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক তাহারা নিকটবর্ত্তী সিসিলি, কর্সিকা এবং সার্ডিনিয়া নামক দ্বীপত্রয় অধিকার করিয়াছিল।

এই সিসিলি দ্বীপেই কার্থেজের সহিত রোমের প্রথম সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। রোম এবং কার্থেজ উভয়ই সিসিলিতে আধিপত্য স্থাপনের জন্য ব্যস্ত ছিল এবং এই আধিপত্যস্থাপনের জন্য উভয় জাতির মধ্যে যে মহাসমর আরম্ভ হয় তাহাই প্রাচীন ইতিহাসে পিউনিক যুদ্ধ নামে খ্যাত। প্রথম বারের পিউনিক যুদ্ধ খৃঃ পূঃ ২৬৪ অব্দে আরম্ভ করিয়া ২৪১ অব্দ পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। এই যুদ্ধে মোটের উপর রোমানেরাই জয়লাভ করে এবং যুদ্ধাবসানে উভয় পক্ষের মধ্যে যে সন্ধি সংস্থাপিত হয় তদনুসারে কার্থেজিয়ানগণকে বাধ্য হইয়া সিসিলি পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া আসিতে হয়।

কিন্তু এখানেই তাহাদের দুর্দ্দশার শেষ হইল না। কিয়ৎকাল

পরে নিজেদের মধ্যে অন্তর্বিদ্রোহ উপস্থিত হওয়াতে সুযোগ বুঝিয়া রোমানগণ কর্সিকা এবং সার্ডিনিয়াও কার্থেজহইতে কাড়িয়া লইল।

এই সময়ে কার্থেজে হামিলকার নামক একজন প্রসিদ্ধ রণকুশল সেনাপতির আবির্ভাব হয়। তিনি রোমানদিগের অন্যায় ব্যবহারে নিতান্ত বিরক্ত হইয়া অল্পসংখ্যক সৈন্যসহ স্পেইনে গমনপূর্ব্বক তথায় একটী কার্থেজিয়ান সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং ৮ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমের পর স্পেইনের অধিকাংশ কার্থেজের অধিকারভুক্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

এই হেমিলকারের ঔরসে ২৪৫ খৃঃ পূঃ অব্দে হানিবলের জন্ম হয়। তাঁহার বাল্য ইতিহাস সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। কথিত আছে হানিবলের বয়স যখন ৯ বৎসর তখন তাঁহার পিতা তাঁহাকে দেবমন্দিরে নিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়াছিলেন যে এজীবনে তিনি কখনও রোমের সহিত সখ্য সংস্থাপন করিবেন না। হামিলকারের মৃত্যুর পর তদীয় জামাতা হাস্‌ড্রুবাল স্পেইনের প্রধান সেনাপতি পদে বৃত হন এবং কিছুদিন পরে হাসড্রুবল নিহত হইলে হানিবলই স্পেইনের সেনাপতিত্ব লাভ করেন।

অনেক দিন হইতেই রোম জয়ের সংকল্প তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল। বাল্যকালে দেবমন্দিরের প্রতিজ্ঞা তিনি কখনও বিস্মৃত হন নাই। কাযেই স্পেইনে সেনাপতিপদ প্রাপ্ত হইয়াই তিনি ইটালীজয়ের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। স্পেইনে শান্তি স্থাপন করিতে তাঁহার কয়েক বর্ষ চলিয়া গেল। অবশেষে

২১৮ খৃঃ পূঃ অব্দে ৯০০০০ পদাতিক এবং ১২০০০ অশ্বারোহী সৈন্য সহ তিনি রোম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আইবেরস নদী পার হইয়া তিনি পিরানিজ পর্ব্বত অতিক্রম করিলেন এবং প্রাচীন গলদেশের দক্ষিণ প্রান্ত দিয়া রোণ নদীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

এদিকে রোমানগণও নিশ্চিন্ত ছিলেন না। অবিলম্বে সিপিওর অধীনে একদল সৈন্য প্রেরিত হইল। উদ্দেশ্য হানিবল যাহাতে রোণ নদী অতিক্রম করিতে না পারে। কিন্তু সিপিওর উদ্দেশ্য সফল হইল না। তিনি আসিয়া দেখিলেন হানিবল পূর্ব্বেই নদী পার হইয়া আল্প্‌স্‌ পর্ব্বতের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তখন আর কি করেন, আপনার সৈন্যদলকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া একদল স্পেইনে প্রেরণ করিলেন এবং অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া তিনি ইটালীতে ফিরিয়া গেলেন।

এদিকে হানিবল রোণ নদী অতিক্রম করিয়া আল্প্‌স্‌ পর্ব্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইলেন। আল্প্‌স্‌ পর্ব্বত অতিক্রম করিতে পারিলেই তিনি ইটালীতে পদার্পণ করিতে পারেন। কিন্তু অভ্রভেদী আল্প্‌স্‌ পর্ব্বত অতিক্রম করা সহজসাধ্য নয়। কি প্রকারে হানিবল এতগুলি সৈন্য সমভিব্যাহারে এই পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম করিলেন তাহা আজও সমস্ত জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সেই সময়ে পার্ব্বত্য দেশে এখনকার মত কোন পথঘাট ছিল না, পর্ব্বতের শিখরদেশ তুষারমণ্ডিত, তদুপরি দুর্দ্ধর্ষ পার্ব্বত্য জাতির আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা কতদূর কঠিন তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু

হানিবল কিছুতেই ভীত হওয়ার লোক ছিলেন না, অমিত তেজের সহিত সমস্ত সৈন্যসহ বন্ধুর পার্ব্বত্য পথে তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে শীতে তুষারে তাহার বিস্তর সৈন্য ক্ষয় হইল, পার্ব্বত্য অধিবাসিগণের আক্রমণেও তাঁহার যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছিল।

কিন্তু যে অসামান্য একনিষ্ঠা এবং সহিষ্ণুতা তাঁহার চির-জীবনের সহচর ছিল তাহারি বলে এই বিঘ্নবিপদের মধ্যেও তিনি ধৈর্য্যচ্যুত হইলেন না। সকল বিপদ উপেক্ষা করিয়া সকল কষ্ট সহ্য করিয়া তিনি ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং অবশেষে অতি অল্পসংখ্যক সৈন্যসমভিব্যাহারে পর্ব্বতশ্রেণীর পরপারে ইটালীর উত্তরভাগে অবতরণ করিলেন।

এস্থানে কিছুকাল বিশ্রাম করিয়া তিনি দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হওয়ার উদ্যোগ করিতেছেন এমন সময় শুনিতে পাইলেন রোমান সেনাপতি সিপিও একদল সৈন্যসহ তাঁহার গতিরোধার্থ উপস্থিত হইয়াছেন। অবিলম্বে টিসিনাস নামক নদীতীরে উভয় পক্ষের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হইল। সিপিওর সৈন্যসংখ্যা হানিবল অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। কিন্তু যুদ্ধে রোমানেরা সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইল, স্বয়ং সিপিও আহত হইয়া রণক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিলেন।

হানিবল পো নদী অতিক্রম করিয়া দক্ষিণমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সিপিও কিছুতেই তাঁহার সম্মুখীন হইতে সাহসী হইলেন না এবং ট্রেবিয়া নদীর নিকটস্থ পার্ব্বত্য প্রদেশে অবস্থান পূর্ব্বক অপর একদল রোমান সৈন্যের আগমন প্রতীক্ষায় রহিলেন।

অবশেষে উভয় রোমান সৈন্যদলের মিলন সংঘটিত হইলে মিলিত সৈন্যশ্রেণী অমিততেজে হানিবলের সম্মুখীন হইল। সিপিও আশা করিয়াছিলেন যে এই সৈন্যগণের সাহায্যে তিনি হানিবলকে ইটালী হইতে বিতাড়িত করিতে পারিবেন। কিন্তু ফল বিপরীত হইয়া দাঁড়াইল। ট্রেবিয়া নদীতীরে উভয় পক্ষের মধ্যে এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। যদিও হানিবলের সৈন্যসংখ্যা বিপক্ষের তুলনায় অতি সামান্য ছিল, কিন্তু তাঁহার অসামান্য রণকৌশল এবং অতুলনীয় বীরত্ব এবারও তাঁহার গলে জয়মাল্য প্রদান করিল। রোমান সৈন্য শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল এবং রোমান সেনাপতিদ্বয় যুদ্ধক্ষেত্রহইতে প্রস্থানপূর্ব্বক প্লেসেন্‌সিয়ার সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় লাভ করিলেন।

ট্রেবিয়ার যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া হানিবল ঐপ্রদেশেই শীতকাল যাপন করিলেন, কিন্তু দারুণ শীতে তাঁহার অনেক সৈন্য প্রাণ পরিত্যাগ করিল, তাঁহার সমস্ত হাতী মরিয়া গেল এবং তিনি নিজে কোনরূপে আত্মরক্ষা করিলেন।

শীতাবসানে হানিবল পুনরায় দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিয়া আপিনাইন পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম করিলেন। এই অভিযানে হানিবলকে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হইয়াছিল এবং প্রদাহজনিত পীড়াতে তাঁহার একটী চক্ষু নষ্ট হইয়া গেল। যাহাহউক সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অবশেষে তিনি কিমুলি নামক নগরে উপস্থিত হইলেন।

এই বৎসর রোমানদের নূতন সেনাপতি সার্ভিলিয়াস্ এবং

ফ্লেমিনিয়াম বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে হানিবলের সম্মুখীন হইলেন। তাহাদের সৈন্যসংখ্যা এত অধিক ছিল যে রোমান-দিগের বিজয় সম্বন্ধে এবার কাহারও মনে সন্দেহ রহিল না। কিন্তু বিধিলিপি অন্যরূপ। ট্রেসিমিনি হ্রদের নিকট যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে রোমান সৈন্য কেবল যে পরাজিত তাহা নয় একবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। সহস্র সহস্র রোমান সৈন্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিল, সেনাপতিদ্বয়ের মৃতদেহ যুদ্ধক্ষেত্রে পড়িয়া রহিল, বহুলোক হ্রদের জলে নিমগ্ন এবং ১৫০০০ সৈন্য হানি-বলের হস্তে বন্দী হইল। বন্দীগণের মধ্যে রোমান সৈন্যদিগকে আবদ্ধ রাখিয়া হানিবল ইটালীর অন্যান্য প্রদেশের সৈন্যদিগকে বিনাপণে ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার আশা ছিল যে ইটালীর অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসিবর্গের সহিত সদ্ব্যবহার করিলে তাহারা রোমের অধীনতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার পক্ষে যোগ-দান করিবে এবং তাঁহাকে ইটালীর উদ্ধারকর্ত্তা বলিয়া বরণ করিয়া লইবে। কিন্তু হানিবলের এই আশা ফলবতী হয় নাই। ইটালীর অধিবাসিগণ এই বিপদের সময় রোমের পক্ষ পরিত্যাগ করিতে অসম্মত হইল।

হানিবল ক্যাম্পানিয়া নামক উর্ব্বর সমতল ভূমিতে অবতরণ পূর্ব্বক নানা স্থান লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। ফেবিয়ান নামক রোমের নূতন কন্‌সাল এবং সেনাপতি কিছুতেই তাঁহার সহিত সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হইল না। দূরে দূরে থাকিয়া নানাপ্রকারে হানিবলের সৈন্যগণের প্রতি উৎপাত করিতে লাগিল। এদিকে হানিবল ক্রমশঃ অগ্রসর হইয়া আপুলিয়াতে প্রবেশপূর্ব্বক

রোমান সৈন্যের ধ্বংসসাধনের সুযোগ খুজিতেছিলেন। একবার রোমান সেনাপতি মিনুসিয়াসকে ফাঁদেও ফেলিয়াছিলেন, কিন্তু ফেবিয়ান হঠাৎ উপস্থিত হইয়া তাহার সাহায্য করাতে এযাত্রা রোমান সৈন্য বাঁচিয়া গেল।

সেই বৎসর সমস্ত শীতকাল ব্যাপিয়া রোমানগণ যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিল। তাহারা মনে করিয়াছিল যে একবার যদি অধিকসংখ্যক সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত করিয়া হানিবলকে পরাস্ত করিতে পারা যায় তাহা হইলে বাধ্য হইয়াই তাঁহাকে ইটালী ত্যাগ করিতে হইবে।

এজন্য যথেষ্ট আয়োজন চলিতে লাগিল এবং যেখানে যত রোমান সৈন্য ছিল সমস্ত একত্র করিয়া ভ্যারো এবং পলাস নামক সেনাপতিদ্বয় কেইসিতে অবস্থিত হানিবলের সম্মুখীন হইলেন। রোমানদিগের অধীনে ৮০,০০০ পদাতিক এবং ৬০০০ অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। হানিবলের সৈন্যসংখ্যা উহার অর্দ্ধেক, কিন্তু এই যুদ্ধে হানিবল যে অসাধারণ রণকৌশল এবং বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহার দৃষ্টান্ত জগতে বিরল। বিরাট রোমান বাহিনী সম্পূর্ণরূপে পরাজিত এবং একবারে বিনাশ প্রাপ্ত হইল। ৫০০০০ সৈন্য রণক্ষেত্রে চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হইল। এই নিহত ব্যক্তিগণের মধ্যে কন্সাল পলাস, গত বৎসরের কন্সালদ্বয়, মিনুসিয়াস, প্রায় ৮০ জন সিনেটের সভ্য এবং বহুসংখ্যক সম্ভ্রান্ত-বংশোদ্ভব ব্যক্তি ছিলেন। একমাত্র ভ্যারো কয়েকজন সৈন্য লইয়া পলায়ন করিতে পারিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্ত রোমান সৈন্য হত আহত বা বন্দীকৃত হইয়াছিল।

এতবড় যুদ্ধে জয়লাভের পর হানিবল মনে করিলেন যে রোমের অধীনস্থ প্রদেশসমূহ এক্ষণে রোমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ-পতাকা উড্ডীন করিবে। তাঁহার অভিপ্রায় আংশিক পূর্ণ হইলেও তিনি যাহা আশা করিয়াছিলেন তাহার কিছুই হইল না। কতকগুলি প্রদেশ তাঁহার পক্ষে যোগদান করিয়াছিল সত্য, কিন্তু অনেকেই রোমানপক্ষে রহিয়া গেল।

কেইনির যুদ্ধে যদিও একদল রোমান সৈন্য পরাজিত এবং বিধ্বস্ত হইয়াছিল তথাপি রোমানগণ একবারে হতাশ্বাস হয় নাই। তাহারা এক্ষণে অধিকতর সতর্কতার সহিত হানিবলের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল এবং সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর না হইয়া নানা উপায়ে তাঁহাকে বাধা দিতে চেষ্টা করিল।

এদিকে হানিবল দক্ষিণ ইটালীতে আপনার প্রাধান্য রক্ষা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মাসিডন এবং সিরাকিউসের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিলেন এবং অত্যল্পকালের মধ্যেই টারেণ্টাম নামক প্রসিদ্ধ বন্দর তাঁহার হস্তগত হইল।

কিন্তু এই অসম বিরোধ আর কতদিন চলিতে পারে? একদিকে হানিবল একা, সঙ্গে মাত্র একদল সৈন্য, তাহাও অরিরত যুদ্ধে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতেছিল, অপরদিকে রোমানদিগের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ সমরনিপুণ সমগ্র একটী জাতি। তারপর হানিবল ইটালীর অন্যান্য প্রদেশ হইতে যে সাহায্য পাওয়ার আশা করিয়াছিলেন তাহা পান নাই, স্বদেশ হইতেও তিনি নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। তিনি নিজে

বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, যেখানে স্বয়ং উপস্থিত হইয়াছেন সেখানহইতেই রোমানদিগকে বাধ্য হইয়া পলায়ন করিতে হইয়াছে। কিন্তু তিনি একা সকল স্থানে উপস্থিত থাকিতে পারেন নাই, কাযেই তাঁহার অনুপস্থিতিতে রোমানগণ একে একে তাঁহার অধিকৃত স্থানগুলি পুনরধিকার করিয়া লইল। ২১১ খৃঃ পূঃ অব্দে কেপুয়া রোমানকর্ত্তৃক পুনরধিকৃত হইল, এবং তাহার ৩ বৎসর পরে ট্যারেণ্টামও হানিবলের হস্তচ্যুত হইল।

হানিবলের এখন একমাত্র ভরসা হাস্‌ড্রুবালের ইটালী আগমন। হাস্‌ড্রুবাল স্পেইন দেশে রোমান সৈন্য পরাজিত করিয়া ভ্রাতার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইতেছিলেন। ২০৮ খৃঃ পূঃ অব্দে আইবেরাস নদী পার হইয়া গলরাজ্যে প্রবেশ করিলেন এবং পর বৎসর আল্‌প্‌স্ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ইটালীতে পদার্পণ করিলেন। এদিকে রোমের কন্সালদ্বয়ের মধ্যে একজন হানিবলের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন এবং অপর একজন হাস্‌ড্রুবালের গতিরোধ করিবার জন্য উত্তর ইটালীতে উপস্থিত হইলেন। হ্যাসড্রুবাল ইটালীহইতে ভ্রাতার নিকট পত্রসহ লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন। কথা ছিল উভয় ভ্রাতা আম্ব্রিয়াতে সম্মিলিত হইবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পত্রবাহক ঐ পত্রসহ রোমানদিগের হস্তে পতিত হইল। কাযেই হানিবল ভ্রাতার আগমনসংবাদ কিছুই জানিতে পারিলেন না। এদিকে রোমান কন্সাল নিরো—যিনি হানিবলের গতিরোধ করিতে নিযুক্ত ছিলেন—রাত্রিতে বিপক্ষের

অজ্ঞাতসারে ৭০০০ সৈন্যসহ উত্তরাভিমুখে প্রস্থানপূর্ব্বক অপর কন্সালের সহিত মিলিত হইলেন। এই মিলিতসৈন্যদলের সহিত মিটরাস নামক নদীতীরে বিপক্ষের যুদ্ধ হইল। হ্যাসড্রুবাল ভ্রাতার ন্যায় বীর ছিলেন এবং এই যুদ্ধে অসাধারণ রণকৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু রোমানদিগের সৈন্যসংখ্যা এত অধিক ছিল যে কিছুতেই তাহাদিগকে পরাভূত করিতে পারিলেন না। যখন দেখিলেন সব শেষ হইল তখন স্বয়ং রণক্ষেত্রের মধ্যস্থলে প্রবেশপূর্ব্বক স্বীয় প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। বর্ব্বর এবং নৃশংস রোমানগণ আনন্দে অধীর হইয়া হাসড্রুবালের ছিন্ন মুণ্ড তাঁহার ভ্রাতার শিবিরে ফেলিয়া দিল। ভ্রাতার ছিন্ন মুণ্ড দর্শনে শোকাভিভূত হানিবল কাতরকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "আমি এই ছিন্ন মুণ্ডে কার্থেজের ধ্বংস দেখিতে পাইতেছি।"

যাঁহার আগমনের প্রতীক্ষায় তিনি এতদিন দক্ষিণ ইটালীতে বসিয়াছিলেন, যাঁহার সহিত মিলিত হইয়া তিনি রোম অধিকার করিবার আশা করিয়াছিলেন, সেই প্রিয়তম ভ্রাতার এই শোচনীয় মৃত্যুতে তিনি হৃদয়ে অত্যন্ত ব্যথা পাইলেন। বুঝিতে পারিলেন যে নিজের সামান্যসংখ্যক সৈন্যদ্বারা রোম বশীভূত করিবার চেষ্টা বৃথা। স্বদেশহইতে কোন প্রকার সাহায্য পাওয়ায় আশা নাই, কাযেই এখনহইতে তিনি বিপক্ষকে আক্রমণ না করিয়া আত্মরক্ষায় প্রবৃত্ত হইলেন। যেখানে যত বিক্ষিপ্ত সৈন্য ছিল সমস্ত ইটালীর দক্ষিণপ্রান্তে সমবেত করিয়া বিপক্ষের আক্রমণ প্রতীক্ষায় রহিলেন।

এ দিকে রোমানগণ স্পেইনে আপনাদের রাজ্য বিস্তার

করিতেছিল। হাসড্রুবাল স্পেইন পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলে যে সকল সেনাপতির উপর স্পেইন রক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছিল তাহারা রোমানদিগের বিরুদ্ধে কিছুই করিয়া উঠিতে পারিল না। রোমের প্রসিদ্ধ সেনাপতি সিপিও ক্রমে ক্রমে স্পেইনের অধিকাংশ রোমসাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইলেন।

স্পেইন অধিকারের পর রোমানগণ সমুদ্র পার হইয়া কার্থেজে পদার্পণ করিল। সিপিও কার্থেজে প্রবেশপূর্ব্বক ক্রমান্বয়ে অনেকগুলি যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া কার্থেজকে এতদূর বিপন্ন করিয়া তুলিলেন যে কার্থেজিয়ানগণ অগত্যা হানিবলকে কার্থেজ রক্ষার্থ ইটালী পরিত্যাগ পূর্ব্বক চলিয়া আসিতে আদেশ করিল। কাযেই খৃঃ পূঃ ২০৩ অব্দে হানিবল ক্ষুণ্ণমনে সাশ্রু-নয়নে ইটালী ত্যাগ করিয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন।

কার্থেজে উপস্থিত হইয়া হানিবল স্বদেশের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে আর জয়ের আশা নাই। তিনি সন্ধি করিবার জন্য স্বদেশবাসিগণকে পরামর্শ দিলেন এবং যাহাতে সন্ধি স্থাপিত হয় তজ্জন্য নিজে যথেষ্ট চেষ্টা করিলেন। কিন্তু এই সময়ে কার্থেজের শাসনকর্ত্তৃগণ যুদ্ধ করিবার পক্ষেই মত প্রকাশ করাতে অনিচ্ছাসত্ত্বে বাধ্য হইয়া হানিবলকে সমর-ক্ষেত্রে অবতরণ করিতে হইল।

খৃঃ পূঃ ২০২ অব্দের অক্টোবর মাসে জামা নামক সমর-প্রাঙ্গণে উভয় পক্ষের শেষ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। রোমানদিগের অধিনায়ক ছিলেন মহাবীর সিপিও এবং কার্থেজের পক্ষে জগদ্বিখ্যাত হানিবল। হানিবলের শত্রুরাও স্বীকার করিয়াছেন

যে জামার যুদ্ধে তিনি অসাধারণ বীরত্ব এবং অপূর্ব্ব রণকৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু সৈন্যসংখ্যার, বিশেষতঃ অশ্বারোহী সৈন্যের, অল্পতা বশতঃ তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহার পক্ষে ২০০০০ সৈন্য রণক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করিল। হানিবল যুদ্ধক্ষেত্র হইতে কার্থেজে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক জামার যুদ্ধবৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া ভবিষ্যৎ যুদ্ধের নিষ্ফলতা প্রদর্শন পূর্ব্বক স্বদেশবাসীদিগকে পুনরায় সন্ধি স্থাপনের পরামর্শ প্রদান করিলেন। অবিলম্বে সন্ধি স্থাপিত হইল।

দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধের অবসানের পর হানিবল আর কার্থেজে অবস্থান নিস্প্রয়োজন মনে করিয়া সিরিয়ার রাজা এণ্টিওকাসের নিকট গমনপূর্ব্বক তাহাকে রোমানদিগের বিরুদ্ধে ইটালীতে তাঁহার অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করিতে পরামর্শ প্রদান করিলেন। এণ্টিওকাস তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিলেন না। ফলে এই হইল যে রোমকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া হানিবলকে রোমানদিগের হস্তে সমর্পণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। হানিবল এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া অবিলম্বে সিরিয়া পরিত্যাগপূর্ব্বক বিথনিয়ার রাজা প্রুসিয়াসের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

কিন্তু এখানে যাইয়াও তিনি রোমানদিগের ভীষণ বৈর-নির্য্যাতনস্পৃহা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন না। রোমানেরা যেই শুনিতে পাইল তিনি বিথনিয়াতে অবস্থান করিতেছেন অমনি হানিবলকে রোমান হস্তে অর্পণ করিবার জন্য প্রুসিয়াসের নিকট দূত প্রেরিত হইল। প্রুসিয়াস নিজ গৃহের অতিথিকে শত্রু-

হস্তে অর্পণ করিতে অস্বীকৃত হইলেন, অথচ রোমানদিগের ভয়ে সে কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলেন না। হানিবল প্রুসিয়াসের সমস্যা বুঝিতে পারিয়া আশ্রয়দাতা বন্ধুকে ভবিষ্যৎ বিপদ হইতে মুক্ত করিবার জন্য স্বয়ং বিষপানে আত্মহত্যা করিলেন।

জগদ্বিখ্যাত মহাবীরের এই শোচনীয় পরিণাম বিধিলিপির অলঙ্ঘনীয়তাই প্রমাণ করিতেছে। যে মহাবীর অল্পসংখ্যক সৈন্য সহ ১৫ বৎসর কাল ইটালীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আপনার আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন, যিনি এই দীর্ঘ কালের মধ্যে দুর্দ্ধর্ষ রোমানদিগকে অন্যূন ১৫টী সম্মুখ যুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করিয়াছিলেন, অনুকূল অবস্থা হইলে যিনি প্রাচীন জগতে স্বদেশের একচ্ছত্র আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিতেন অন্তিম সময়ে তিনি শৃগাল কুকুরের ন্যায় একস্থান হইতে স্থানান্তরে তাড়িত হইয়াছিলেন, অবশেষে অবস্থাধীনে তাঁহাকে নিজের প্রাণ নিজেই বিনাশ করিতে হইল। তাঁহার ব্যর্থতার প্রধান কারণ স্বদেশীয়দিগের সহানুভূতির অভাব। ইটালীতে রোমের সহিত অবিরত যুদ্ধে তাঁহার সৈন্যসংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু কার্থেজ হইতে তাঁহার সাহায্যর্থ কোন সৈন্য প্রেরিত হয় নাই। তার পর রোমের অধীনস্থ প্রদেশসমূহ অনেকেই রোমের পক্ষ পরিত্যাগ করে নাই। একজন ব্যক্তির পক্ষে সমগ্র একটী জাতির সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করা একপ্রকার অসম্ভব। হানিবল সেই অসাধ্য সাধন করিয়াছিলেন, কিন্তু রোমকে পদানত করিতে পারেন নাই।

না পারুন, জগতের সমক্ষে তিনি যে বীরত্বের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা চিরকাল তাহাকে অমর করিয়া রাখিবে।

নদ, নদী ও সমুদ্র।

(১)

মেঘ হইতে বৃষ্টিরূপে যে জল ভূমিতে পতিত হয় তাহার কিয়দংশ বাষ্পীভূত হইয়া উড়িয়া যায়, কিয়দংশ ভূগর্ভে শোষিত হয়। অপরাংশ ভূপৃষ্ঠে নিম্নাভিমুখে প্রবাহিত হইতে থাকে। যেস্থান অপেক্ষাকৃত সমতল তথায় এই প্রবাহ অতি মৃদু, কিন্তু যেখানে ভূমি অসমতল অর্থাৎ একধার উচু একধার নীচু, তথায় বৃষ্টির জল তীব্রবেগে উচ্চস্থান হইতে নিম্নদিকে চলিতে থাকে। প্রথমতঃ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধারায় বিভক্ত থাকে, কিন্তু চলিতে চলিতে এই ক্ষুদ্র ধারাগুলি মিলিত হইয়া বৃহত্তর ধারায় পরিণত হয়। এই বৃহত্তর ধারাসমূহ আবার মিলিত হইয়া অতি বৃহৎ ধারার সৃজন করে। এই সুবৃহৎ ধারাগুলিই নদী এবং উপনদী নামে অভিহিত হয়।

সাধারণতঃ দেখা যায় যে পার্ব্বত্য প্রদেশই অধিকাংশ নদীর উৎপত্তিস্থান। তাহার কারণ সহজেই বোধগম্য। পার্ব্বত্য প্রদেশে সাধারণতঃ প্রভূত পরিমাণ বৃষ্টি পতিত হইয়া থাকে। তারপর পার্ব্বত্য প্রদেশের কোন স্থান অত্যন্ত উচ্চ এবং কোন স্থান নিতান্ত নিম্ন। ভূমি অত্যন্ত বন্ধুর এবং খাড়াই, কাযেই বৃষ্টির জল কোথাও তিষ্ঠিতে না পারিয়া কতকগুলি ধারায়

বিভক্ত হইয়া নিম্নাভিমুখে চলিতে থাকে। পথিমধ্যে এই ধারা-সমূহ মিলিত হইয়া একটী বৃহৎ ধারায় পরিণত হয় এবং ক্রমে সমতল ভূমিতে উপস্থিত হইলে যদিও স্রোতোবেগ কতকটা মন্দীভূত হয়, তথাপি উভয়তীরবর্ত্তী প্রদেশহইতে সলিলরাশি আহরণ পূর্ব্বক ক্রমশঃই উহা বিস্তার লাভ করিতে থাকে। এজন্যই গিরিতরঙ্গিণীসমূহ স্বল্পকায়া, কিন্তু বেগবতী, পক্ষান্তরে সমতল প্রবাহিতা নদীসকল বিপুলদেহা, কিন্তু মৃদুগতি। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে বেগবানই হউক কি বেগহীনই হউক জলস্রোত সর্ব্বদাই নিম্নাভিমুখ। কাযেই নদীস্রোত ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখে বহিতে থাকে। সম্মুখে উচ্চভূমির সাক্ষাৎ পাইলে উহাকে এড়াইয়া নিম্নভূমির অনুসন্ধান করিয়া লয়, এজন্যই নদীর গতি সাধারণতঃ বক্র। এই প্রকারে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেশ দেশান্তর হইতে জলরাশি আহরণ করিয়া ক্ষুদ্র গিরিতরঙ্গিণী অবশেষে মহাসমুদ্রে আশ্রয় লাভ করে।

নদী এবং উপনদীগুলি আর কিছুই নহে—অতিরিক্ত বৃষ্টি-জনিত জল নিষ্কাশনের পথমাত্র। আকাশহইতে যে অজস্র বৃষ্টিধারা পৃথিবীতে আগমন করে উহাতো একস্থানে স্থির থাকিতে পারে না, কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট পথ ধরিয়া সমুদ্রাভিমুখে চলিতে থাকে, এই পথগুলিরই নাম নদী বা উপনদী। কাযেই যে দেশে বৃষ্টি বেশী তথায় নদীও অনেক। গ্রীষ্মপ্রধান ও বৃষ্টিবহুল দেশে যেরূপ বড় বড় নদী দেখিতে পাওয়া যায় শীতপ্রধান শুষ্ক স্থানে তদ্রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না।

আমাদের দেশে শীতকালে অনেক নদী শীর্ণকায়া থাকে,

আবার বর্ষাকালে বিপুল আকার ধারণ করে। ইহার প্রধানতঃ দুইটী কারণ। প্রথমতঃ বর্ষাকালে অত্যধিক বৃষ্টিনিবন্ধন নদীর জল বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। দ্বিতীয়তঃ অধিকাংশ নদীরই জন্ম অত্যুচ্চ পর্ব্বতশিখরে। ঐ শিখরদেশসমূহ শীতকালে বরফে আবৃত থাকে। আবার গ্রীষ্মকালে অত্যধিক সূর্য্যোত্তাপে বরফ গলিয়া জলধারার সৃজন করতঃ নদীবক্ষে প্রবাহিত হয়। এ জন্যই গ্রীষ্মাবসানে অর্থাৎ বর্ষাকালে নদীর জলের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

ইংলণ্ড প্রভৃতি শীতপ্রধান দেশে গ্রীষ্মকালে বৃষ্টির অভাব-নিবন্ধন নদীর আকার সঙ্কুচিত হয়। আবার বৃষ্টির পরিমাণ বৃদ্ধি পাইলে নদীর আকারও বাড়িয়া যায়। কিন্তু বৃষ্টির জলই যে নদীর একমাত্র পোষক তাহা নহে। বৃষ্টির সম্পূর্ণ অভাব হইলেও নদীর জল একবারে শুষ্ক হয় না। তাহার কারণ পর্ব্বতগাত্রস্থ উৎস এবং ঝরণাগুলি সর্ব্বদাই নদীর জল যোগাইতেছে। নদীর উভয় তীরবর্ত্তী ভূগর্ভ হইতে ক্ষীণ জল-ধারাগুলিও সর্ব্বদাই নদীতে আসিয়া মিশিতেছে। কাযেই বৃষ্টির অভাবে নদীসমূহ শীর্ণকায় হইলেও একবারে বিশুষ্ক হয় না।

নদী ও সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে এবং তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশে জল-বৃদ্ধির অপর কারণ সমুদ্রের জোয়ার। সমুদ্রে যখন জোয়ার আসে তখন সেই জোয়ারের জল নদীমুখে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া নদীর জল বৃদ্ধি করিয়া থাকে, আবার ভাটার সময় জল কমিয়া যায়। এইপ্রকারে নানাকারণে নদীর জলের সর্ব্বদাই হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিতেছে।

উপরে আমরা নদী এবং উপনদী সমূহের উৎপত্তির বিষয় আলোচনা করিলাম, এইক্ষণে নদীসকল কি কি কার্য্য সাধন করিয়া থাকে তাহারই আলোচনা করিব। প্রথমতঃ নদীসমূহ নানাবিধ পদার্থ বহন করিয়া সমুদ্রে উপহার প্রদান করিয়া থাকে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে প্রধানতঃ পর্ব্বতগাত্রস্থ উৎস এবং ঝরণার জলদ্বারা নদীসমূহ পুষ্ট হয়। কাযেই এই সমস্ত উৎস এবং ঝরণার জলে যেসকল ধাতুদ্রব্য দ্রব-ভাবাপন্ন আছে তাহাও নদীর জলে মিশ্রিত হইয়া থাকে। তারপর যে ভূমির মধ্য দিয়া নদী প্রবাহিত হয় তথাহইতেও অনেক ধাতুজ দ্রব্য আপনার জলে মিশাইয়া লয়। এইসমস্ত ধাতুজ দ্রব্যের মধ্যে চূণজাতীয় দ্রব্যই প্রধান এবং বর্ষে বর্ষে প্রচুরপরিমাণে নানাবিধ ধাতুদ্রব্য নদীকর্ত্তৃক বাহিত হইয়া সমুদ্রে নীত হইয়া থাকে।

তারপর বালু, মৃত্তিকা, প্রস্তরাংশ সমূহও প্রচুরপরিমাণে নদীস্রোতকর্ত্তৃক বাহিত হয়। বৃষ্টির পর নদীর জল যে ঘোলা হয় তাহার কারণ এই যে বৃষ্টির জলের সহিত অনেক মাটী ও বালি আসিয়া নদীর জলের সহিত মিশিয়া যায়। পর্ব্বতগাত্র-হইতে প্রস্তরখণ্ডসমূহ বিচ্ছিন্ন হইয়া নদীস্রোতে নিম্নাভিমুখে নীত হয়। প্রকৃতপক্ষে ভূপৃষ্ঠের সর্ব্বপ্রকার ক্ষয়িত অংশের বাহকই নদী। নদীসমূহ ক্রমাগত পর্ব্বতগাত্র এবং ভূপৃষ্ঠ হইতে প্রস্তরখণ্ড, মৃত্তিকা ও বালুকারাশি বহন করিয়া সমুদ্রাভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছে।

নদনদীসমূহ যে কেবল ভূপৃষ্ঠের ক্ষয়িত অংশই বহন করিয়া

থাকে তাহা নহে, নিজেরাও ভূপৃষ্ঠের অনেক পরিবর্ত্তন সাধন করে। নদীর যে অংশ প্রস্তরময় ভূমির উপর দিয়া প্রবাহিত তথায় নদীস্রোতে ঐ প্রস্তরভূমির ক্ষয় সাধন হইয়া থাকে, এবং যে সকল প্রস্তরখণ্ড নদীস্রোতে বাহিত হয় উহারা ক্রমশঃ ক্ষয়িত হইয়া মসৃণ ও গোলাকার হইয়া উঠে। পর্ব্বত-গাত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার কালে প্রস্তরখণ্ডগুলি সাধারণতঃ বন্ধুর এবং ধারাল থাকে, নদীস্রোতে বাহিত এবং ঘর্ষিত হইয়া উহারা ক্রমশঃ মসৃণতা প্রাপ্ত হয়। তারপর অবিরত প্রস্তরের ঘর্ষণে এবং স্রোতোবেগে নদীর তলদেশও ক্ষয়িত হইয়া ক্রমশঃ গভীর হইতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে বহুপরিমাণ বালু ও মৃত্তিকা-রাশি নদীতল হইতে আল্‌গা হইয়া স্রোতোবেগে অন্যত্র নীত হয়।

এক্ষণে দেখিতে হইবে যে নদীকর্ত্তৃক বাহিত মাটী, বালু ও পাথরের টুক্‌রা প্রভৃতির গম্যস্থান কোথায়। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে ঐসকল পদার্থ নদীর তলদেশে আশ্রয় লাভ করে। একথা কিয়ৎ পরিমাণে সত্য হইলেও অধিকাংশ ভাগই নদীস্রোতে ক্রমশঃ নিম্নাভিমুখে নীত হয়। আবার অনেক নদীরই তীরদেশ সমতল ভূমি। অত্যধিক বৃষ্টিনিবন্ধন বা অন্য কারণে নদীর জল বৃদ্ধি পাইলে অনেক সময় তীরভূমি প্লাবিত হয়। এই প্লাবনকালে নদীর জল বহুবিস্তৃত হওয়াতে উহার স্রোতোবেগ মন্দীভাব ধাবণ করে। কাযেই নদীর জলে যে মৃত্তিকা বালু বা প্রস্তরাংশসকল বর্ত্তমান ছিল তাহা তীরবর্ত্তী সমতলভূমিতে আশ্রয় লাভ করে। এইপ্রকারে প্রতিবর্ষেই

বন্যাহেতু নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশসমূহ বালু এবং মৃত্তিকাযোগে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে থাকে এবং ক্রমে এত উচ্চ হয় যে খুব প্রবল বন্যা না হইলে জলপ্লাবনের কোনও আশঙ্কা থাকে না, কিন্তু যে সকল নিম্নস্থান নদী ও সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত অথবা তন্নিকটবর্ত্তী তথায় সমুদ্রের জোয়ার আসিয়া সমস্ত স্থান ডুবাইয়া দেয়। এজন্য পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গের অনেক স্থান বর্ষাকালে প্রায় ৩।৪ মাস জলমগ্ন থাকে।

আবার অনেক নদীর তীরবর্ত্তী প্রদেশসমূহ এরূপ মৃত্তিকায় গঠিত যে নদীর স্রোতোবেগে তীরদেশ ভাঙ্গিয়া যায় এবং এই প্রকারে প্রভূত মৃত্তিকারাশি নদীর জলে মিশ্রিত হইয়া স্রোতোবেগে অন্যত্র নীত হইয়া থাকে। তারপর নদীস্রোতে চলিতে চলিতে যদি এমন স্থানে পৌঁছায় যথায় স্রোতোবেগ অপেক্ষাকৃত মৃদু, তবে সেইস্থানে নদীগর্ভে সঞ্চিত হইয়া চরভূমির সৃজন করে। এই প্রকারে পদ্মা, মেঘনা প্রভৃতি বৃহৎ নদীগর্ভে বর্ষে বর্ষে অনেক চরভূমির সৃষ্টি হইয়া থাকে।

বড় বড় নদীর মোহনাতে যে বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড দৃষ্ট হয় ইহারও ঐ একই কারণ। নদী যেস্থানে সমুদ্রে পতিত হয় তথায় জলস্রোত বাধা পাইয়া অনেক পরিমাণে মন্দীভূত হয়। কাযেই নদীকর্ত্তৃক আনীত বালু ও মৃত্তিকারাশি তথায় নদীর তলদেশে আশ্রয় লাভ করিয়া ক্রমশঃ সঞ্চিত হইতে থাকে এবং অবশেষে নদীপৃষ্ঠ হইতে উচ্চ হইয়া নদীর মুখকে দুই বা ততোধিক ভাগে বিভক্ত করিয়া দেয়। কাযেই নদীস্রোত সমুদ্রের অদূরবর্ত্তী প্রদেশে কয়েকটী বিভিন্ন ধারা

অবলম্বনপূর্ব্বক সমুদ্রে মিশিয়া থাকে। এই ধারাসমূহের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে ইংরেজীতে Delta এবং বাঙ্গালায় বদ্বীপ বলে। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, নীলনদ প্রভৃতি বড় বড় নদীর মোহানাতে এই ভাবে বিস্তীর্ণ বদ্বীপের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এখানেই যে নদীকর্ত্তৃক আনীত সমস্ত দ্রব্যসম্ভার উৎসর্গীকৃত হয় তাহা নহে। অধিকাংশ ভাগই সমুদ্রের কুক্ষিগত হইয়া নদনদী সমূহের প্রভু-ভক্তির পরিচয় দিয়া থাকে।

(২)

সমুদ্রের তীরে দণ্ডায়মান হইয়া অকূল জলরাশির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দর্শকের হৃদয় বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া যায়। তারপর মধ্য সমুদ্রে গমন করিলে সে বিস্ময় আরও গভীর হইতে থাকে। কোথাও পার কূল কিছুই দৃষ্ট হয় না, কোন প্রাণী বা বৃক্ষলতার সহিত সাক্ষাতের সম্ভাবনা থাকে না, চতুর্দ্দিকে কেবল নীল জলরাশি, সেই জলরাশির উপর তরঙ্গসমূহ সূর্য্যকিরণে উদ্ভাসিত হইয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে। ঊর্দ্ধে অনন্ত নীল আকাশ, নিম্নে অকূল নীল জল, দিবা নাই রাত্রি নাই ক্রমাগত একই দৃশ্য, তরঙ্গগর্জ্জনের একই শব্দ। প্রাণ তখন শুষ্ক ভূমিতে আসিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, মনে হয় কত দিনে আবার আমাদের জননী শস্যশ্যামলা বসুন্ধরার সাক্ষাৎ পাইব।

এই সমুদ্র যে কত গভীর সহজে তাহা ধারণা করা যায় না, কিন্তু সমুদ্রের গভীরতা সকল স্থলে সমান নহে। কোন স্থানে ৩।৪ মাইলের উপর আবার কোথাও ২০০ ফিটও নহে। প্রশান্ত

মহাসাগর সর্ব্বাপেক্ষা গভীর। সমুদ্রের গভীরতা পরিমাপ করিবার জন্য এক প্রকার লৌহনির্ম্মিত রজ্জু সাহায্যে আজকাল অনেক স্থানেরই গভীরতা শুদ্ধরূপে পরিমাপ করা হইয়াছে। সমুদ্রের গভীরতা গড়ে প্রায় ২॥ মাইল। অ্যাটলাণ্টিক মহাসমুদ্রের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গভীরতা ৪½ মাইল এবং জাপানের সন্নিকটে প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতা স্থানে স্থানে ৫ মাইলেরও অধিক। ভূপৃষ্ঠের মাঝে মাঝে যেমন খাদ এবং নিম্নভূমি আছে সমুদ্রেও তদ্রূপ। কিন্তু এই খাদগুলি বহু বিস্তীর্ণ নহে। মোটের উপর ভূপৃষ্ঠের ন্যায় সমুদ্রতলও অসমোচ্চ। ভূপৃষ্ঠে যেমন উপত্যকা, অধিত্যকা এবং সমতল ভূমি আছে, সমুদ্রেও তদ্রূপ। সমুদ্রের মধ্যদেশ সাধারণতঃ সর্ব্বাপেক্ষা গভীর এবং তীরের দিকে গভীরতা ক্রমশঃ কম। সমুদ্রের যেসব শাখা ভূভাগের দিকে প্রবেশ লাভ করিয়াছে তাহাদের গভীরতা অপেক্ষাকৃত অল্প। ইংলণ্ডের পশ্চিম দিকে অ্যাটলাণ্টিক মহাসাগর অত্যন্ত গভীর, আবার পূর্ব্বদিকে উত্তর সাগরের গভীরতা ৪০০ ফিটের অধিক নহে।

সকলেই জানেন সমুদ্রের জল লবণাক্ত। এই লবণের পরিমাণ সমুদ্রের জলে প্রায় সর্ব্বত্রই সমান। কেবল বৃষ্টির পরিমাণের পার্থক্যহেতু স্থানে স্থানে সামান্য ইতরবিশেষ হইয়া থাকে। সাধারণতঃ সমুদ্রের জলে লবণের পরিমাণ শতকরা ৩½ ভাগ, তবে ভূভাগান্তর্বর্ত্তী সমুদ্রে লবণের পরিমাণ কিঞ্চিৎ অধিক। ভূমধ্যসাগরে লবণের পরিমাণ শতকরা ৪ ভাগ, লোহিত সাগরে ৫ ভাগ, মরু সাগরে লবণ শতকরা ২৪ ভাগ।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে সমুদ্রজল লবণাক্ত হওয়ার কারণ কি? এবিষয়ে অনেকে অনেক কারণ প্রদর্শন করেন। কিন্তু নিম্নলিখিত কারণটীই সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

অতিপূর্ব্বকালে পৃথিবী একটী উষ্ণ বাষ্পপিণ্ড মাত্র ছিল। উহাতে নানাবিধ পদার্থ উষ্ণ ও বাষ্পীভূত অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। এই বাষ্পপিণ্ড ক্রমশঃ শীতল হইয়া স্থল ও জলভাগে পরিণত হইয়াছে। যে অংশ সর্ব্বাগ্রে শীতল হইয়া কঠিন অবস্থা ধারণ করিয়াছে তাহাই বর্ত্তমানে স্থলভাগ নামে পরিচিত। জলীয় অংশ ইহার অনেক পরে শীতল হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। এই উষ্ণ জলীয়বাষ্প শীতল হইয়া জলভাগের সৃজন-কালে সঙ্গে সঙ্গে লবণবাষ্পসমূহকে দ্রবীভূত করিয়া আপনার সঙ্গে মিশাইয়া লইয়াছে। তদবধি বহুবিধ লবণ-জাতীয় পদার্থ সমুদ্রজলে মিশ্রিত অবস্থায় আছে।

তারপর আর একটী কারণবশতঃও সমুদ্রজল কতকটা লবণাক্ত হওয়ার কথা। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে অবিরত জলীয় বাষ্প উত্থিত হইতেছে। কিন্তু এইভাবে কেবল বিশুদ্ধ জলভাগই বাষ্পে পরিণত হয়। লবণভাগ সমুদ্রজলে পড়িয়া থাকে। পক্ষান্তরে নদনদীসমূহ প্রভূতপরিমাণ লবণজাতীয় পদার্থ বহন করিয়া সমুদ্রে আনয়ন করে। কাজেই একদিকে বিশুদ্ধ জল-ভাগের বাষ্পীভবন অপরদিকে নদনদীকর্ত্তৃক ভূপৃষ্ঠ হইতে নানা জাতীয় লবণপদার্থ আনীত হইয়া সমুদ্রজলে মিশ্রণ—এই উভয় কারণে সমুদ্রজলে লবণের মাত্রা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

সমুদ্রজল লবণমিশ্রিত বলিয়া উহার আপেক্ষিক গুরুত্ব বিশুদ্ধ জল অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বেশী। সাধারণতঃ সমুদ্রজলের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১'০২৬। কোন কোন স্থানে ইহার সামান্য ইতরবিশেষ হয়। ভূমধ্যসাগরস্থ জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১'০২৯, কৃষ্ণসাগরে ১'০১২, মরুসাগরে ১'২২৭।

স্থানবিশেষে সমুদ্রজলের উষ্ণতারও প্রভেদ আছে। সমুদ্রপৃষ্ঠস্থ জলের উত্তাপ বিষুবরেখার সন্নিকটস্থ প্রদেশে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী এবং মেরুপ্রদেশে সর্ব্বাপেক্ষা কম। আবার গ্রীষ্মকালে যতটা উষ্ণ শীতকালে তত নয়। কিন্তু একই ঋতুতে এবং একই স্থানে সমুদ্রপৃষ্ঠের জল যে পরিমাণ উষ্ণ সমুদ্রগর্ভস্থ জল তত উষ্ণ নয়। সমুদ্রের গভীরতা পরিমাপ কালে সমুদ্রজলের উষ্ণতারও পরীক্ষা হইয়াছে। এই পরীক্ষায় জানা গিয়াছে যত নিম্নে যাওয়া যায় সমুদ্রজলের উষ্ণতাও ততই কমিতে থাকে, কিন্তু প্রথম প্রথম যতটা কমে বেশী নিম্নে গেলে তত কমে না।

বেলাভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া সমুদ্রের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে সমুদ্রজল কখনও একবারে স্থির থাকে না। যখন সমস্ত প্রকৃতি নিস্তব্ধপ্রায় তখনও সাগরবারি ঈষৎ আন্দোলিত হয়। তারপর দিবারাত্রিতে কোন কোন সময় সমুদ্রের জল বৃদ্ধি পাইয়া স্রোতের সৃজন করত তীরদেশের কতকাংশ প্লাবিত করে, আবার অন্য সময় জলরেখা তীরদেশ হইতে অনেক নিম্নে সরিয়া যায়। ইহাকেই সমুদ্রের জোয়ার ভাটা বলে। কিন্তু সমুদ্রপৃষ্ঠের জলই যে কেবল এইভাবে চালিত হয় তাহা নহে। সমুদ্রগর্ভেও নানা দিগ্‌গামি প্রবল স্রোত আছে। এইসকল স্রোত

এত প্রবল যে বড় বড় বরফস্তূপসমূহ উহাদের দ্বারা বায়ুপ্রবাহের প্রতিকূলে চালিত হইয়া থাকে।

সমুদ্রে প্রধানতঃ ৪ প্রকারের প্রবাহ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। প্রথমতঃ সর্ব্বদাই সমুদ্রের জলে ঈষৎ আন্দোলন দৃষ্ট হয়। দ্বিতীয়তঃ জোয়ার এবং ভাটার দরুণ সমুদ্রের জল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া স্রোতের উৎপাদন করে। তৃতীয়তঃ বায়ুপ্রবাহদ্বারা সমুদ্রপৃষ্ঠে তরঙ্গ উৎপন্ন হয়। চতুর্থতঃ সমুদ্রগর্ভস্থ গভীর জলের স্রোতসমূহ।

সমুদ্রের উপরিভাগে যে সর্ব্বদাই ঈষৎ আন্দোলন দৃষ্ট হয় তাহার কারণ বায়ুর চঞ্চলতা। বায়ুমণ্ডল কখনই একবারে স্থির হয় না। নির্ব্বাতপ্রায় প্রদেশেও ঈষৎ বায়ুপ্রবাহ বিদ্যমান থাকে। কাজেই সমুদ্রপৃষ্ঠ সর্ব্বদাই একটু আন্দোলিত হয়। তারপর বায়ু যখন প্রবলবেগে বহিতে থাকে তখন সমুদ্রেও বড় বড় ঢেউ উঠে। ঝড়ের সময় সমুদ্রের ভয়ঙ্করী মুর্ত্তি দেখিলে কাহার না প্রাণে আতঙ্কের সঞ্চার হয়? বড় বড় প্রকাণ্ড ঢেউ তীরে আসিয়া আঘাত করিতে থাকে। প্রকৃতি শান্তভাব ধারণ করিলেও ঢেউয়ের পর ঢেউ চলিতে থাকে, বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহার নিবৃত্তি হয় না। তারপর সমুদ্রের মধ্য-দেশে ঢেউ না থাকিলেও তীরদেশে গভীর গর্জ্জনে অনবরত বড় বড় ঢেউ আসিয়া আঘাত করে। ইংরাজীতে ইহাদিগকে breaker বলে। উপকূলসন্নিহিত সমুদ্রজলের অগভীরতাই ইহার প্রধান কারণ। কত যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া সমুদ্রের এই তরঙ্গমালা গভীরগর্জ্জনে তীরদেশকে বিক্ষোভিত করিতেছে কে তাহার ইয়ত্তা করিবে?

সমুদ্রতরঙ্গের আঘাতহেতু তীরদেশের অবিরত ক্ষয়সাধন হইয়া থাকে। তীরভূমি বালু ও মৃত্তিকাপ্রধান হইলে এই ক্ষয়-ক্রিয়া দ্রুতবেগে চলিতে থাকে। তীরদেশ প্রস্তরময় হইলেও সমুদ্রের হাত হইতে একবারে নিষ্কৃতি পায় না। অনবরত জলের আঘাতে এবং তীরস্থ প্রস্তরখণ্ডসমূহের ঘর্ষণে পাহাড় ভূমিও ক্ষয় পাইতে থাকে। তীরদেশ সাধারণ মৃত্তিকাময় হইলে সমুদ্রতরঙ্গের অবিরত আঘাতে উহা ক্রমশঃ ভাঙ্গিয়া যায়। এই ভাবে বহু সমতলভূমি এক্ষণে সমুদ্রের কুক্ষিগত হইয়াছে।

এক্ষণে সমুদ্রের তলদেশের অবস্থাসম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাউক। সমুদ্রের গভীরতার পরিমাপকালে উহার তলদেশে যে সমস্ত পদার্থ আছে তাহাও কিয়ৎপরিমাণে তুলিয়া আনা হইয়াছে এবং তদ্দ্বারা বর্ত্তমান কালে বৈজ্ঞানিকগণ সমুদ্রতলের অবস্থা সম্বন্ধে অনেকটা জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। এইরূপ পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে সমুদ্রতলে বালি, মৃত্তিকা প্রভৃতির সঙ্গে শঙ্খ শামুক প্রভৃতি জৈব পদার্থ এবং নানাবিধ উদ্ভিদ্ পদার্থ প্রভূতপরিমাণে বিদ্যমান আছে।

ভূপৃষ্ঠের যেমন সর্ব্বদাই নানাবিধ পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে সমুদ্র-তলেও সেই প্রকার পরিবর্ত্তন অহরহ ঘটিতেছে। তবে ভূপৃষ্ঠের পরিবর্ত্তন প্রধানতঃ ক্ষয়ের দিকে, সমুদ্রতলের পরিবর্ত্তন সঞ্চয়ের দিকে। নদনদীসমূহ অবিরত পৃথিবীপৃষ্ঠের ক্ষয়িত অংশগুলি সমুদ্রতলে আনিয়া পুঞ্জীভূত করিতেছে। কাযেই সমুদ্রতলে যে ভূপৃষ্ঠের ক্ষয়িত অংশগুলি পাওয়া যাইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু এই সমস্ত দ্রব্য প্রধানতঃ সমুদ্রের উপকূল সন্নিধানেই

প্রাপ্ত হওয়ার কথা, সমুদ্রের মধ্যদেশে ইহাদের চিহ্নও পাওয়া যায় না। তথাকার তলদেশ লাল এবং ধূসর মৃত্তিকাময়। সম্ভবতঃ এই মৃত্তিকা সমুদ্রগর্ভস্থ আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হইতে প্রাপ্ত। অধিকন্তু সমুদ্রে নানাবিধ জৈব এবং উদ্ভিদ্ পদার্থ আছে। এই সমস্ত জৈব ও উদ্ভিদ্ পদার্থের মৃত্যু হইলে উহাদের দেহাবশিষ্ট সমুদ্রতলস্থ মৃত্তিকাদির সঙ্গে মিশিয়া যায়। কাযেই বালি, মৃত্তিকা প্রভৃতির সঙ্গে সমুদ্রজ জীবের কঙ্কাল এবং উদ্ভিজ্জের দেহাবশিষ্টসমূহ ক্রমাগত মিশ্রিত হইয়া একীভূত হইতেছে।

সমুদ্রের কোন কোন প্রদেশে এই জীবকঙ্কাল এত প্রভূত-পরিমাণে সঞ্চিত হয় যে তদ্দ্বারা দ্বীপের সৃষ্টি হইয়া থাকে। ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরে এই প্রকার জীব (coral) দ্বারা গঠিত দ্বীপ অনেকগুলি বর্ত্তমান আছে। অ্যাটলাণ্টিক মহা-সাগরের তলদেশ ooze নামক জীবকঙ্কালদ্বারা অনেকদূর পর্য্যন্ত আবৃত।

এক্ষণে পৃথিবীর কোন প্রদেশে যদি এইসকল পদার্থের দর্শন ঘটে তবে বুঝিতে হইবে সেই স্থান কোন না কোনও কালে সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত ছিল। অনেক পর্ব্বতের শিখরদেশে সমুদ্রজ জীবকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। এজন্য পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে ঐ সকল পর্ব্বতশিখরও কোন সময় জলমগ্ন ছিল। হিমালয় পর্ব্বতেরও কোন কোন স্থান একদা জলমগ্ন ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। কারণ এইসকল স্থানে যেসকল জীবকঙ্কাল দৃষ্ট হয় তাহা সমুদ্র ভিন্ন আর কোথাও বাস করিতে পারে না।

কর্ত্তব্য-সম্পাদন।

আমাদের কর্ত্তব্য কি এবিষয়ের মীমাংসা অনেকস্থলেই কঠিন নয়। আমাদের মোটামুটি কর্ত্তব্যগুলি সুনির্দ্দিষ্ট। কাহাকেও উহা বলিয়া দিতে হয় না। এবিষয়ে বিবেকবুদ্ধিই আমাদের প্রধান সহায়, কোথাও কোন সন্দেহ উপস্থিত হইলে এই সহজ বুদ্ধি কাহার কি কর্ত্তব্য তাহা অভ্রান্তরূপে স্থির করিয়া দেয়। অবশ্য, ক্রমাগত পাপাচরণ দ্বারা যাহাদের সদসৎ বিচারবুদ্ধি লোপ পাইয়াছে তাহাদের কথা স্বতন্ত্র।

মানুষের কর্ত্তব্যগুলিকে নানাশ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। প্রথমতঃ আমাদের নিজের প্রতি কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে। নিজের দেহকে সুস্থ রাখিতে হইবে, শারীরিক ও মানসিক বৃত্তিগুলির অনুশীলন করিতে হইবে, বিশুদ্ধ বিমল আনন্দদ্বারা হৃদয়ের সজীবতা রক্ষা করিতে হইবে। এইগুলি নিজের প্রতি কর্ত্তব্য। কিন্তু নিজের প্রতি কর্ত্তব্য ব্যতীত সংসারে আরও অনেক কর্ত্তব্য আছে। মানুষ কখনও একাকী সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন এবং স্বতন্ত্রভাবে বাস করিতে পারে না। সে এই সমগ্র মানবজাতির ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। কাযেই অন্যান্য মানবের সহিত সে নানা সম্বন্ধে আবদ্ধ এবং প্রত্যেক সম্বন্ধ-জনিত কতকগুলি বিশেষ কর্ত্তব্য তাহাকে সম্পাদন করিতে হয়।

পুত্রের প্রতি পিতামাতার কর্ত্তব্য, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য, স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য, ভ্রাতাভগিনীর প্রতি পরস্পরের

কর্ত্তব্য আছে। এগুলি পারিবারিক কর্ত্তব্য। ইহার সুসম্পন্ন না হইলে পারিবারিক সম্বন্ধ শিথিল হইয়া যায়।

তারপর সামাজিক কর্ত্তব্য। সমাজের প্রত্যেক লোকের অপরের প্রতি কর্ত্তব্য আছে। সমাজস্থ অপরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ, বয়োজ্যেষ্ঠ মাননীয় ব্যক্তিদের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন, অন্যের বিপদে যথাসাধ্য সাহায্য করা ক্ষুধিতকে অন্নদান, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনাপ্রদান—এইসব কর্ত্তব্য সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির অবশ্য প্রতিপাল্য। এসব কর্ত্তব্য সম্পাদিত না হইলে সমাজ চলিতে পারে না—সামাজিক বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়; মানবসমাজ ক্রমশঃ ধ্বংসের মুখে অগ্রসর হয়।

স্বদেশের প্রতিও প্রত্যেক লোকের কতকগুলি কর্ত্তব্য আছে। দেশের সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য চেষ্টা করা, যে সমস্ত অভাব ও অভিযোগ আছে তাহা দূর করিবার চেষ্টা করা প্রত্যেক স্বদেশহিতৈষীর কর্ত্তব্য কার্য্য। এমন কি প্রয়োজন হইলে দেশের জন্য অকাতরে প্রাণবিসর্জ্জনও করিতে হয়।

সর্ব্বোপরি ভগবানের প্রতি কর্ত্তব্য। ভগবান্ আমাদের সকলের পিতা, সকলের কর্ত্তা। ভগবান্‌কে ভক্তি করা, তাঁহার আদেশ পালন করা প্রত্যেক ব্যক্তিরই কর্ত্তব্য।

এতদ্ব্যতীত বিশেষ বিশেষ অবস্থায় কতকগুলি বিশেষ কর্ত্তব্য আছে। কতকগুলি কর্ত্তব্য চাকরি বা বিষয়কার্য্য ঘটিত। প্রভুর প্রতি ভৃত্যের কর্ত্তব্য, কর্ম্মচারীর প্রতি প্রভুর কর্ত্তব্য, রাজার প্রতি প্রজার কর্ত্তব্য এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

প্রকৃতপক্ষে সমগ্র মানবজীবন কতকগুলি কর্ত্তব্যের সমষ্টি

মাত্র। জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতিপদবিক্ষেপে মানুষকে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হইবে। এই কর্ত্তব্যসম্পাদনেই মানুষের মনুষ্যত্ব, এই কর্ত্তব্যসম্পাদনেই মানবজীবনের চরম পুরুষার্থ, কর্ত্তব্যসম্পাদনই মানবের ধর্ম্ম। যতটুকু কর্ত্তব্য করিতে পারিলাম ততটুকু ধর্ম্মের পথে রহিলাম। যতটুকু কর্ত্তব্যের ত্রুটী হইল ততটুকু ধর্ম্মহইতে বিচ্যুত হইলাম।

সমস্ত মানবসমাজ এই কর্ত্তব্য জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক ব্যক্তিই যদি তাহার কর্ত্তব্যসম্পাদনে অবহেলা করিত তবে এত বড় মানবসমাজ অবিলম্বে ছারখার হইয়া যাইত। অনেক লোকে যথাসাধ্য তাহাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করে বলিয়াই সংসার এতদিন টিকিয়া আছে। আবার অনেক স্থলে কর্ত্তব্যের লঙ্ঘন হয় বলিয়াই সংসারে এত দুঃখ, এত অশান্তি এবং এত অসম্পূর্ণতা বিরাজমান।

কর্ত্তব্যনিষ্ঠাই সর্ব্বপ্রকার ব্যক্তিগত এবং জাতীয় উন্নতির মূল। যে জাতির জনসাধারণ কর্ত্তব্যপরায়ণ সে জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই ইহার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হইবে। পাশ্চাত্য জাতিসমূহের মধ্যে কর্ত্তব্যপরায়ণতার ভাব অত্যন্ত প্রবল বলিয়াই তাহারা আজ জগতের সর্ব্বত্র আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। উহারা এতদূর কর্ত্তব্যপরায়ণ যে যাহার উপর যে কার্য্যের ভার থাকে প্রাণপণে সে উহা সম্পাদন করে এবং তজ্জন্য নিজের ব্যক্তিগত সুখ, সুবিধা এবং স্বার্থ অম্লানবদনে বিসর্জ্জন করিয়া থাকে। ট্রাফালগারের যুদ্ধে নেলসন যখন ঘোষণা

করিয়াছিলেন যে ইংলণ্ড আশা করে যে প্রত্যেকে তাহার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবে, সেই মহান্ আহ্বানে সকলে মিলিয়া আপনাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করাতেই ট্রাফালগারের যুদ্ধে ইংরাজের জয়-লাভ হয়।

এই যে ভারতবর্ষের ন্যায় একটা প্রকাণ্ড দেশ ইংরাজ-কর্ত্তৃক শাসিত হইতেছে তাহারও মূলে ইংরাজের কর্ত্তব্য-পরায়ণতা। ইংরাজ কর্ম্মচারিদের মধ্যে যিনি যে পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন তিনিই তাহার কর্ত্তব্যসকল অম্লানচিত্তে, নির্ভীকভাবে, যথাসাধ্য সম্পন্ন করিতেছেন। এইকর্ত্তব্যবুদ্ধির নিকট নিজের স্বার্থ সুবিধা প্রভৃতিও তাহারা বলিদান করিতে প্রস্তুত। এজন্যই ইংরাজ জাতি পৃথিবীর নানা স্থানে আপনাদের আধিপত্য আজ পর্য্যন্তও অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছে।

কর্ত্তব্য সম্পাদন সকল সময় সহজ নহে। যেসকল কর্ত্তব্য আমাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিসমূহের অনুকূল সেইসকল কর্ত্তব্য সাধনে তত কষ্ট বোধ হয় না। মাতার হৃদয় সর্ব্বদাই স্বীয় সন্তানের প্রতি স্নেহরসে আর্দ্র, কাযেই সন্তানপালনরূপ গুরু-ভারও তাঁহার নিকট লঘু বলিয়া বোধ হয়। স্বামী যে স্ত্রীর প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া এবং স্ত্রী যে সর্ব্বদা স্বামীসেবা করিয়া এবং স্বামীর আদেশ পালন করিয়া নিজকে কৃতার্থ মনে করেন, তাহার প্রধান কারণ পরস্পরের মধ্যে প্রণয়ের আকর্ষণ। পরস্পরের প্রতি স্নেহমমতার সংমিশ্রণে আমাদের পারিবারিক কর্ত্তব্যগুলি অনেক সময় মধুময় হইয়া থাকে।

কিন্তু এই মানসিক বৃত্তিগুলির সহিত কর্ত্তব্যজ্ঞানের যখন

বিরোধ উপস্থিত হয়; যখন কর্ত্তব্যবুদ্ধি মানুষকে একদিকে, স্বাভাবিক স্নেহ মমতা অপরদিকে প্রবলবেগে আকর্ষণ করিতে থাকে তখন মানবহৃদয়ে এক ভয়ঙ্কর সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়। এরূপ স্থলে স্বাভাবিক বৃত্তিগুলিকে প্রশমিত করিয়া কর্ত্তব্য-বুদ্ধিকে জাগ্রত রাখিতে প্রভূত সৎসাহসের দরকার হয়। মহাত্মা রাজা রামচন্দ্র যখন প্রজাবর্গের মনোরঞ্জনার্থ গর্ভবতী সীতাকে বনে প্রেরণ করিয়াছিলেন তখন তাঁহার মনে যে কি ভাবের উদয় হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। একদিকে সরলহৃদয়া পতিপরায়ণা সুখদুঃখের চিরসঙ্গিনী সীতাদেবীর প্রতি গভীর প্রণয়ানুরাগ, অপর দিকে প্রজাবর্গের মনোরঞ্জন—এই দুই বিরোধী ভাব রামের হৃদয়কে কতদূর বিচলিত করিয়াছিল তাহা কে বলিবে? অবশেষে রাজধর্ম্মেরই জয় হইল। মহাত্মা রাজা রামচন্দ্র রাজকর্ত্তব্য প্রতিপালন জন্য প্রাণাপেক্ষা প্রিয়া সরলহৃদয়া সীতাদেবীকে অকাতরে বিসর্জ্জন দিলেন। এরূপ কঠোর আত্মত্যাগ মানব ইতিহাসে বিরল। ব্রুটাস যখন কর্ত্তব্যের অনুরোধে নিজ পুত্রের প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করেন তখনও আমরা এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পরিচয় পাই। এই সব স্থলে দেখা যায় যে কর্ত্তব্যের অনুরোধে স্বাভাবিক স্নেহমমতার বন্ধনও নিতান্ত লঘু বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে।

যে সকল বিরোধী শক্তি মানবকে তাহার কর্ত্তব্য পথ হইতে বিচলিত করিয়া থাকে তন্মধ্যে স্বার্থপরতাই প্রধান। আমরা নিজের সুখ সুবিধা খুজি বলিয়াই অপরের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারি না। এমন কি ভ্রাতা ভগিনী

প্রভৃতি নিকট আত্মীয়স্বজনের প্রতি কর্ত্তব্যসাধনেও আমাদের স্বার্থ আসিয়া বাধা দেয়। এই যে আমরা অসহায়কে সাহায্য করিনা, বিপন্নের উদ্ধারের জন্য কোনও চেষ্টা করি না, অত্যাচারিতের রক্ষার জন্য হস্তোত্তোলন করি না, আমাদের স্বার্থপরতাই কি তাহার একমাত্র কারণ নহে? ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ আমাদিগকে এরূপ অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে যে বিস্তীর্ণ মানবসমাজের প্রতি আমরা তাকাইতে পারি না। স্বার্থের অনুরোধে লোকে যে কেবল কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে বিরত হয় তাহা নহে, অনেকে অকর্ত্তব্য কাজেরও অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। মিথ্যাকথন, প্রবঞ্চনা, পরস্বাপহরণ প্রভৃতি যে সকল পাপকার্য্য প্রত্যহ অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহার মূলে স্বার্থপরতা।

এই স্বার্থপরতা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়া আমাদিগকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করে—কখনও অর্থলালসা, কখনও যশোলিপ্সা, কখনও ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি। যখন যে ভাবেই উপস্থিত হউক এই স্বার্থপরতার প্রবল আকর্ষণে অনেকেই বিচলিত হইয়া পড়ে। সুখলিপ্সা মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক বৃত্তি। সকলেই অল্লাধিক পরিমাণে নিজের সুখ সুবিধা খুজিয়া থাকে, কিন্তু স্বার্থকে বিসর্জ্জন দিয়া অবিচলিতভাবে যাঁহারা স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে পারেন তাঁহারাই জগতের পূজনীয়।

স্বার্থত্যাগ ব্যতীত কোনও মহৎকার্য্য জগতে সম্পাদিত হইতে পারে না। কর্ত্তব্যসম্পাদন এবং স্বার্থবিসর্জ্জন একই কথা। যে ব্যক্তি সর্ব্বদাই আপনার সুখ এবং সুবিধা খুঁজিয়া বেড়ায় কোনও মহান্ কর্ত্তব্য সম্পাদন তাহার পক্ষে অসম্ভব। তাহার

ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ হৃদয়ে কোনও উচ্চভাব স্থান পায় না। সে আপনাকে নিয়াই সর্ব্বদা বিব্রত থাকে অপরের কথা ভাবিবার অবসরও সে পায় না।

যে সকল মহাপুরুষ নিজ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই স্বার্থত্যাগী ছিলেন। মহাত্মা বুদ্ধদেব জগতের শান্তিহীন নরনারীর প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য আপন স্ত্রী পুত্র পরিবার ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য রাজপুত বীরগণ অকাতরে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। এমন কি রমণীগণও কর্ত্তব্যানুরোধে আপন প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এই প্রকার স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে বিরল নহে।

কর্ত্তব্যসম্পাদনের অপর অন্তরায় ভয়। এই ভয় অবস্থা বিশেষে বিভিন্ন আকার ধারণ করে। প্রথম লোকনিন্দার ভয়। এই লোকভয় অনেক সময় আমাদের হৃদয়কে আকুলিত করিয়া তোলে এবং লোকে কি বলিবে এই ভয়েই আমরা ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ি। বিশেষতঃ যখন জনসাধারণের মতের বিরুদ্ধে কোনও কার্য্য সম্পাদন করিতে হয় তখনই সমগ্র জনসমাজ সহস্রকণ্ঠে তাহার নিন্দা ঘোষণা করিতে থাকে। এই লোক-নিন্দার মধ্যে যিনি অবিচলিত থাকিয়া আপনার কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারেন তিনিই মহাপুরুষ।

শুধু লোকনিন্দা নয়, সামাজিক শাসনও অনেক সময় লোকের মনে ভীতির সঞ্চার করিয়া দেয়। সমাজপ্রচলিত

ধর্ম্ম কি আচার ব্যবহারের বিপরীত কোনও কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে গেলেই চতুর্দ্দিক হইতে নির্য্যাতন আরম্ভ হয়। যে সকল মহাত্মা সমাজ ও ধর্ম্ম সংস্কারক বলিয়া জগতের পূজা পাইতেছেন তাঁহাদিগকে জীবিতাবস্থায় যথেষ্ট অত্যাচার এবং নিগ্রহ সহ্য করিতে হইয়াছিল। মহাত্মা মহম্মদ যখন নূতন ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন তখন তাঁহার প্রতি যেসকল অমানুষিক অত্যাচার করা হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। মহাত্মা যীশুখৃষ্ট মানবের পরিত্রাণবার্ত্তা ঘোষণা করিতে যাইয়া ক্রুসবিদ্ধ হইয়াছিলেন। আমাদের দেশেও সামাজিক রীতিনীতির সংস্কার করিতে যাইয়া অনেককে যথেষ্ট লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছে। মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহের পক্ষ সমর্থন করিয়া সমাজের অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়াছেন। স্বর্গীয় মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় আপন কন্যাদিগকে সর্ব্বপ্রথম বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়া একঘরে হইয়াছিলেন। পরলোকগত মধুসূদন গুপ্ত সর্ব্বপ্রথম শবদেহে ছুরিকাঘাত করিয়া সমাজকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু সমাজের ভ্রূকুটীভয়ে ইঁহাদের কেহই কর্ত্তব্যসাধনে পশ্চাৎপদ হন নাই। প্রকৃত বীরের ন্যায় নীরবে সকল অত্যাচার সহ্য করিয়াছিলেন। আজ আমরা তাঁহাদিগকে সম্মান করিতে শিখিয়াছি। তাঁহাদিগের মানসিক সৎসাহস এবং কর্ত্তব্যের প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা তাঁহাদিগকে জগতে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

রাজার শাসনও অনেক সময় ভয়ের কারণ লইয়া উঠে। ধর্ম্মজগতেই রাজার অত্যাচার অতি তীব্রভাবে দৃষ্ট হয়।

পূর্ব্বকালে যাহারা রাজপ্রচলিত ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া স্বীয় মত এবং বিশ্বাসের অনুবর্ত্তন করিতে প্রয়াস পাইত, তাহাদের মধ্যে কতলোক যে রাজাজ্ঞায় নিতান্ত লাঞ্ছিত এবং উৎপীড়িত হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। ইউরোপে মধ্যযুগে এবং ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বকালে এই রাজাজ্ঞায় কত বিশ্বাসী সাধু মহাপুরুষের প্রতি ভীষণ লোমহর্ষণ অত্যাচার হইয়াছে কে তাহার বর্ণনা করিবে? অসংখ্য নরনারী তাহাদের ধর্ম্মমত ও বিশ্বাসের জন্য জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া হাসিতে হাসিতে প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছেন। ইংলণ্ডে মেরীর রাজত্বকালে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্মে বিশ্বাসী বলিয়া মহাত্মা লাটিমার এবং রিডলীকে যখন জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত করা হইয়াছিল তখন লাটিমার সেই অগ্নিকুণ্ড হইতে যে আশা এবং বিশ্বাসের অভয়বাণী উচ্চারিত করিয়াছিলেন তাহা আজও জগতের সর্ব্বত্র ঘোষিত হইতেছে। আর যেদিন শিখগুরু অত্যাচারী মোগলের হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন দিবার কালে বলিয়াছিলেন "শির দিয়া সের নাহি দিয়া" অর্থাৎ মাথা দিলাম কিন্তু ধর্ম্ম দিলাম না, তখন তাঁহার হৃদয়ে যে কি সাহস এবং তেজের আবির্ভাব হইয়াছিল তাহা কে বলিতে পারে? কর্ত্তব্যনিষ্ঠার ভাবে যাহার হৃদয় অনুপ্রাণিত হয় সংসারের দুঃখ কষ্ট এমন কি প্রাণভয়ও তাহাকে কর্ত্তব্যের পথ হইতে অনুমাত্র বিচলিত করিতে পারে না, কোন প্রকার শাসন তাহাকে ভীত করিতে পারে না, কোন বিঘ্ন তাহাকে দমিত করিতে পারে না। কি ক্ষতি হইল, কি কষ্ট আসিল, কতটুক স্বার্থে আঘাত লাগিল—এসব বিষয়ের গণনাও সে করে না;

অটল হিমগিরির ন্যায় আপনার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া যায়। জগতে ইহারাই ধন্য।

এ সংসারে একশ্রেণীর কর্ত্তব্যনিষ্ঠ লোক আছেন যাঁহারা জগতের কোনও বৃহৎ কাজ করিয়া যান নাই। ইতিহাস তাঁহাদের কোন কথা লিখে যাই, কোন কীর্ত্তিস্তম্ভ গৌরবভরে ইঁহাদের স্মৃতিচিহ্ন বক্ষে ধারণ করে নাই। ইঁহারা সাধারণ অবস্থার লোক। ইঁহাদের কর্ত্তব্যও সাধারণ, হয়ত নিজ পরিবার কি নিজ ক্ষুদ্র সমাজের মধ্যে আবদ্ধ। কিন্তু এই কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে তাঁহাদিগকে কত কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে, কত অশ্রু মোচন করিতে হইয়াছে কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? হয়ত এই কর্ত্তব্য সাধনে তিল তিল করিয়া তাঁহাদের জীবন ক্ষয় হইয়াছে, তথাপি তাঁহারা অবিচলিতহৃদয়ে প্রতিকূল ঘটনাস্রোতের সহিত সংগ্রাম করিয়া যথাসাধ্য স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন। এই শ্রেণীর লোকের ধৈর্য্য এবং নির্ভীকতা কম প্রশংসনীয় নহে।

যুদ্ধকালে যে সকল সৈন্য বা সেনাপতি প্রাণবিসর্জ্জন করিয়া থাকে আমরা তাহাদের সাহস এবং নির্ভীকতার কতই প্রশংসা করি। কিন্তু এই সাহস অপেক্ষাও উচ্চতর সাহস এবং বীর্য্যের দৃষ্টান্ত এ সংসারে বিরল নহে। যুদ্ধকালে যোদ্ধাদের হৃদয়ে সাময়িক একটা উত্তেজনা হয়, যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সমগ্র দেশের নিকট গৌরবলাভের আকাঙ্ক্ষাও তাহাদিগকে প্রবলবেগে আকর্ষণ করিতে থাকে। যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইলেও কীর্ত্তিস্তম্ভ অনেক সময় তাহাদের

যশঃ ঘোষণা করিয়া থাকে। কিন্তু যেসকল লোক সাধারণ অবস্থায় অসীম ধৈর্য্য এবং সাহসের সহিত স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া থাকেন তাহাদের স্বার্থত্যাগ জগতের আদর্শ-স্থানীয়, যে কর্ত্তব্যবুদ্ধি তাহাদিগকে প্রণোদিত করে তাঁহা সকলেরই অনুকরণীয়।

কর্ত্তব্যসম্পাদনে নির্ভীকতা অর্জ্জন করিতে হইলে তজ্জন্য হৃদয়কে প্রস্তুত করিতে হয়। কেবল ভগবানে অবিচলিত নিষ্ঠা থাকিলে এই নির্ভীকতা আপনাহইতেই আসিয়া থাকে। ভগবানে যাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে তিনি মনে করেন যে, সংসারের প্রত্যেক কর্ত্তব্য ভগবানেরই কাজ। কর্ত্তব্যসম্পাদন আর ভগবানের প্রীতিসম্পাদন একই কথা। সুতরাং সুখই হউক আর দুঃখই হউক, লোকে নিন্দাই করুক বা প্রশংসাই করুক, প্রাণ থাকুক কি যাউক ভগবানের কাজ করিতেই হইবে। সংসারের দুঃখ কষ্টতো জগজ্জননীর স্নেহের দান। এই ভাব যাহার হৃদয়ে সর্ব্বদা জাগরূক তাহার আর ভয় কি? কর্ত্তব্যের আহ্বানে মাভৈঃ বলিয়া সে অগ্নিকুণ্ডে ঝাপ দিতেও পশ্চাৎপদ হইবে না।

ভগবানে মন রাখিয়া অবিচলিত ভাবে স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য; ইহাতেই মানুষের গৌরব এবং মহত্ত্ব। প্রতিমুহূর্ত্তে আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যেন আমরা কর্ত্তব্যপথ হইতে বিচলিত না হই।